প্রকাশ : ১৩৬২ আশ্বিন

প্রচ্ছদ

পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রকাশক

অসীম দাস

২০৬ বিধান সরণী

কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রাকর

শ্রীবিভাস ভট্টাচার্য

সারস্বত প্রেস

২০৬, বিধান সরণী

কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়
উর্মিলা চট্টোপাধ্যায়কে

রমণীয় মুখশ্রী

রমণীয় মুখশ্রী, যা দেবীভ্রম, বা কল্পনালোক
মনে হয়, শ্বেত মর্মরের বাহু কোমল সস্নেহ,
চোখের ভেতরে অন্য চোখ রাখে, যা বিশ্বভুবন,
বাঁকা হলদে রৌদ্র এসে বরফ-আকীর্ণ চতুর্দিকে
শাদা ও ফিরোজা স্বর্ণে ঝিকিমিকি প্রথম বেলায়,
আমাকে কোথাও নেয়, নিতে চায়, দৃশ্যের ওপারে।
মার্বেল রমণী হাঁটে, শান্ত চোখে দেখে শুদ্ধিময়
যা কেবল দৃষ্টি নয়, যা কেবল ক্ষীয়মান আলো
ধরেনা নিবিড় শান্তি অশ্রুময় কনীনিকা চুঁয়ে—
বরং যেন সে ঝর্ণা, উচ্ছ্রিত যা অনর্গল ধারা,
কেশপাশে সূর্য কাঁপে, স্নিগ্ধ ঘাড়ে কোমল রেখায়
যেন শান্তি গ্রীবা তুলে ওষ্ঠাধরে রেখেছে চুম্বন
যেখানে মাধুরী শান্ত

তুষার ধবল চারিধার

বিষুববেলার বাইরে চিরায়ত ঘন গোধূলিতে
হাতে হাত রাখে কোনো ত্রিভুবন, যেখানে পুরুষ
রমণীর দেহগন্ধে প্রশ্বাসে দ্রাক্ষার স্বাদে
চোখের ভেতরে অন্য চোখ পায়

অন্ধতার কাছে

বড়ই সজীব বড় কৃপাময়ী হয়ে উঠে আসে
সমুদ্র মেখলা ঘেরা মাটি।

বুকের ভিতরে বন্য

বুকের ভেতরে বন্যচিতার বাঁকানো নখ, রক্তের ভিতরে
দৌড়ে চলে যায় দ্রুত গ্রীবাভঙ্গে সারঙ্গ তরুণী,
আমার কেবল এই কস্তুরীগন্ধের বনে ধীর পায়ে হাঁটা
কেবল অশ্রুত সুর পাতা ঝরা বার্চ বনে শোনা।
তুহিন ধবল রাত্রি, তুষার মর্মর সারা বেলা
যেন কোনো একা চাঁদ নিঃশব্দে নীলাভ জ্যোৎস্না হয়,
কেবল অরণ্য গন্ধে, কোনো ফুল, কোন কুঁড়িটির
অস্ফুট, উদ্ভিন্ন হতে আকাঙ্ক্ষায় জেগেছে পরাগ।

রমণী পড়েছে তার নখে রাঙা বসন্তী আবহ,
কেবল তুহিনময় দৃশ্যপটে তুষার তরুণী
পা রাখে বিকচ শুভ্রে, ছিঁড়ে যায় হীরার স্তবক
প্রশ্বাসে কুয়াশা ঘোর রাত্রিগুলি ঘনায় নির্জনে,
গাছের মাথায় শান্ত বহুতল গৃহের শিথানে
বিদ্যুৎ বিকীর্ণ পথে আকাশ মুখশ্রী দেখে তার
যেখানে বিপুল কেশপাশে গাঁথা বেণীবন্ধে তারা
বঙ্কিম ইস্পাত ক্ষিপ্র নদীর ভ্রূভঙ্গে শুয়ে আছে।

জননী অবশ্য জানে

জননী অবশ্য জানে সন্তানের খুশি হাসি অশ্রু অভিমান
শিশু বয়সের বেলা কখন যে চড়ে ওঠে মাথায় ওপরে—
তখনো কি জানা থাকে, সন্তানের বুকে কোন জ্বালা
কোন অভিমান—রৌদ্র ঘাস থেকে অশ্রু শুষে নেয়?

অন্ধ পায়ে পায়ে হাঁটে, কানে আসে শব্দময়তার
অস্তিত্ব, পাখির ডাকে ঋতু, স্বরে নারীর বয়স,
এমনকি মাধুরী তারও, হাওয়া এসে ঘড়ির সময়
ত্বকে বলে, মাটি বীজপত্র কবে খোলে তারও জানা।
সে যেন জননী, কিন্তু তার সঙ্গে অন্য কিছু থাকে,
যেমন পুরুষ, সদ্য রমণীর স্বাদ নিয়ে যার
সবে জাগরণ হলো, যেমন রমণী যার দেহে
স্পর্শগন্ধময় রূপরস ভরা অপার পৃথিবী
পুরুষ ছুঁয়েছে বলে উন্মোচন হলো

যেন শিশু

মাঠের নতুন গন্ধে, কচিপাতা কিশলয় ছুঁয়ে
বিস্ময়ে আশ্চর্য বড়ো, ভেজা ঘাসে পা পড়ে কখন,
জননীর মতো ঢের স্নেহ দিয়ে হাতে পাওয়া এই—
এ গ্রহের রহস্য সন্তান, তবু অন্যতর বোধ
দ্যাখো অন্ধ গভীর অস্তিত্বে সয়, রহস্য গভীর ভূমণ্ডলে
একে একে ধীর পায়ে নানান কামরার দরজা খোলে
গান্ধারী জানতেন বুঝি শত পুত্রে যা মেলেনি বোধে
ঘন কৃষ্ণপট্টে বাঁধা দুটি চোখই অপার ভুবন।

রৌদ্রময়তায়

সাদা বরফের উপরে নিখাদ রোদ
কেমন নীলাভ হীরা উদ্যত ছুরি,
ছিঁড়ে নাও চোখ অমন ধারালো ফলায়
আততায়ী দ্যুতি মেঘেরোদে লুকোচুরি।

অসহায় বার্চ শাখা জটিলতা মোড়া
শ্যামল স্নিগ্ধ দেখেছি যাদের জুনে
বরফ কুটিল কিরীটিনী হয়ে যেন
শীতল চ্ছুরণ ছড়ায় স্মৃতির মুনে।
এবং বাগানে কেয়ারি লালিত ফুল
কোথায় লুকায় রং বেরঙের ডানা,
শুধু গিঁঠে গিঁঠে তুহিন শিমুল তুলা
নাকি নিষ্ঠুর ঋতুর ধাতব হানা।
হাওয়া হয়ে আসে শ্বা-দাঁত ধারালো চিতা
ধ্রুব তারকারও প্রহর জাগানো রাতে
গাছেগাছে রেখাজটিলতাময় বাহু
নাচায় ডাকিনী জরা বলয়িত হাতে।

আমাকে জাগাবে সেই

আমাকে জাগাবে সেই ঘুম থেকে, যা কেবল শীত
বরফ বিস্তারময়, পত্রপুঞ্জহীন নিঃস্ব শাখা
যেমন ভুবন—সেই সুন্দর শূন্যতা থেকে, এমনকি আমার
শোণিতে কেবল সেই অযথা কাজের ঘুমে জেগে থাকা
অযৌন পুরুষ, তার ঘুম ভাঙাবে ? নিঃশব্দে এসেছো।
বসেছ বুকের কাছে। বড়ো কাছে, মাংস ছিঁড়ে আরো নীচে নামো,
তুলে নাও হৃদপিণ্ডকে
তোমাকে দেবার জন্যে সেই
কত দিন কত রাত আদর্শ-অধীর হয়ে পথে হেঁটেছি
হেঁটেছি ভিখারী উর্ধ্বহাতে শুধু অঞ্জলি সাজিয়ে।

এইতো তোমারি ঘরে আগুনের পাশ ঘেঁষে বসেছি পুরুষ।
আঁচ এসে ঘুম ভাঙায় রক্তে, তুমি নুয়েছ বাঁ-কাঁধে
দুহাতের রাঙা নখে ছিঁড়ে নাও ত্বক মাংস শিরা
ভ্যাখো এই কাটা ওষ্ঠ, চুম্বন প্লাবিত করা অসম্ভব যদি
ছিঁড়ে নাও, ছিঁড়ে নাও

বাইরে আরো শীত ঝরছে, ধবল তুষারে
শান্ত এক নীল জ্যোৎস্না তুহিন বিথার থেকে উঠে আসছে
যা মদির হয়ে রক্তে মৃত্যু এনে দিতে পারে,
যা আরাম, প্রেম॥

কোনো জাগরণ নেই

কোনো জাগরণ নেই, ঘুম, শুভ্র হীরায় চ্ছুরিত
শীতল, অথচ হার্দ্য করচাপ, করতলে ফল।
দূরদেশ থেকে যদি বন্ধু আসে, কি দেবার থাকে ?
—নিম্নকণ্ঠ উচ্চারণ. শান্ত চোখে উন্মেষ নীলিমা।
শ্রম মলিনতা দেয়নি, দেয় শান্ত ওষ্ঠাধরে হাসি
দেয় রমণীর পায়ে ঝর্ণাপতনের ছন্দে হরিণীর গতি
পুরুষের করপট্ট ঘন হয় উষ্ণ আমন্ত্রণ।

ভ্যাখো নত হয়ে আসে শুভ্র তুহিনের মতো গ্রীবা
গ্রীবামূলে স্নিগ্ধ রুচি কোমলতা, ধীর উন্মোচিত
পুরুষমোহিনী স্তনরেখা, কটিতটে ক্ষীণ নদী,.
দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে উঠে যায় কোনার্কিনী
যা কিছু স্পর্শের যাদু দেহগন্ধে রক্তে ডুব দেয়,

আসে ঘুম, ঘননিদ্রা, স্বপ্নহীন, চন্দ্র সূর্যহীন
নক্ষত্রনীলিমাহীন
সসাগরা বিপুল শাদায়
মর্মর রমণী আসে, হাত ধরে, দৃশ্যের ভুবনে
একে একে বন্ধ দরজা খুলে যায়। সিঁড়ির ওপরে আরো সিঁড়ি
উন্মোচিত হয়ে যায় যেখানে শ্যামল শস্য, কর্মিষ্ঠা রমণী
ট্রাক্টরে বসেছে, হাওয়া মাথার রুমাল যতো টানে
তরুণী ততই বড়ো ঘন হয়ে রহস্য নিবিড় হয়ে ওঠে॥

১৬ই ডিসেম্বর

দেখেছিলাম প্রবল শীতে তোমার মুখচন্দ্রিকাতে
এক জীবনের মধ্য থেকে অন্যজীবন ছোঁয়ার ছবি,
কত বছর পার হয়েছে, আঙুল গুনি আপন হাতে
যেন আমার মনে হচ্ছে, এই গত রাত, স্পষ্ট সবই।
দীর্ঘ চোখে শান্ত উদাস তমস্বিনী ডুবিয়ে রাখো,
বিপুল বিশ্বভুবন তোমার দেহের ভাঁজে কেমন মোড়া,
তেমনি পায়ের জলচ্ছবি স্নানঅবসান এমনি আঁকো
মিথ্যে আমার দিকভুলে ছুট এখান সেখান মানস ঘোড়া

কোন দেশে লাল সূর্য ওঠেন, কোথায় বসেন সূর্য পাটে,
কেবল আমার মাথার মধ্যে কিলবিলানো নক্সা তারই,
এমন কি এই ঘরের মধ্যে কে আলতো পায় হাল্কা হাঁটে
হদিশ রাখাও মনে হয়েছে বসবাসের-বা বাড়াবাড়ি।

স্বজন যাদের ঢের ভেবেছি এখন হন্যে তাদের চাপে
ওলোটপালোট বার-ভেতরের রক্তচোখে দুঃখ সাধা
কেউ গোনে-বা ভ্রূ-ভঙ্গে ভাঁজ, কেউ-বা শব্দে ওজন্ মাপে
কেউ-বা খাঁচায় বোল শেখাচ্ছে রাধেকৃষ্ণ, কৃষ্ণরাধা।

এখন অন্য শীতের দেশে শান্ত শাদা তুহিন ঝরে
গাছগাছালি হাত বাড়িয়ে আকাশ থেকে জীবন খোঁজে
তরুণী যায় অযৌন বেশ শীত পোষাকে পথের মোড়ে
দীর্ঘ শান্ত নিদ্রা এসে রাত্রি দিয়ে দুচোখ বোঁজে।
যেন আমার বিশ্ব চাওয়া মূর্চ্ছা এখন অন্ধতা আর
রংবাহারী কল্কা শাড়ি হাওয়ার টুকরো হাজারটাতে
পা ফেলে যাই ঠাণ্ডা মেঝেয়, বুকের মধ্যে সেই একা যার
দেখা হয়েছে প্রবল শীতে কখন-যে মুখচন্দ্রিকাতে॥

শুধু ঘরবার

শুধু ঘরবার, শুধু পদপাতে ধ্বনি জাগরণ,
মৃদু তটস্পর্শ করে নদী যায় স্রোতভঙ্গে তরুণীর ঠোঁটে,
এবং গমকহীন সেতারের শান্ত স্নিগ্ধ আলাপের মতো
গাছের পাতায় সারারাত জমা চুঁয়ে ঝরা শিশিরের ধীর
শব্দগুলি আবর্তিত, ঘাসে পড়ে, ফুল ভিজে যায়
এমনি বসন্ত-গ্রীষ্ম মনে হতো

এখন প্রবল এই শীতে
দ্রুত পা নর্তকী নারী সিঁড়ি ভাঙে, পদছন্দে তার
ধমনীতে রক্ত কাঁপে, শব্দ যায় বরফের মাঠে

নগ্ন পত্রহীন গাছে, অদৃশ্য স্তবকে শাদা ফুলে,
যেন জ্যোৎস্না জমা হয়ে হীরার কুট্টিম, আর ভাষা
গলে যায় ওষ্ঠ তাপে, ক্ষীণ নদী, নাকি প্রস্রবণ
চোখ বুজে দেখি সেই মৃদু উষা, রূপালী বিদ্যুৎ।

ভাষা

চোখ ছিঁড়ে নেবে, চোখ ফিরে দেবে বলে এই আসা,
এখন চোখের মধ্যে ঢের চোখ দৃশ্য দেখে, সেই
বনস্থলি, রণস্থলি, তুহিন তুন্দ্রায় পশু শস্য গোচারণ,
বড় স্নেহ দিয়ে প্রতি শব্দ ছেনে আগুনের আঁচে
নরম করেছো, দাঁতে চেপে দুঃখে আদল দিয়েছো
তারপর নদী প্রবাহের মতো ধীর ধারা, কঠিনতা হীন
তরল রহস্যে নামছে।—পুরুষের বাহুতে যে ভাষা
রমণীর ওষ্ঠাধরে সে বড়ো মোহিনী জাগরণ॥

জাগরণ

এখন ঠাণ্ডা শূন্যের ঢের নীচে,
বরফ মাঠে উড়াল রৌদ্র ফুলকিতে দাউ দাউ
নগ্নবাহু বৃক্ষ আঁচে আঙুল সেঁকে নেয়—
বাস চলেছে, ট্রাম-ট্রলিবাস, আর একদিন পরেই
সবুজ ক্যারের মাথায় তারা, বছর,

বুঝি শীতের পরে সবাই বসন্তকে চায়,
সকল ত্রাসের শেষ যেমনটি হয়—
সমস্ত বীজ, সব গোচারণ, সমস্ত ট্রাক্টর
সেই সময়ের প্রতীক্ষাতে রয়।

ঘুমের মধ্যে এমন শীতে শুয়ে আছেন তিনি
যিনি বীজের গভীরে বীজায়ন,
মস্কো হাঁটে, মস্কো চলে, সেই সোনালী তারায়
তিনিই আছেন বলেই জাগরণ ॥

হীরা ঝলসিত ছুরি

অমল ধবল হীরা ঝলসিত ছুরি
চোখের মধ্যে দ্রুত কেটে বসে শীতে
পা থেতলে চলি বরফ মোরেম নুড়ি
হাওয়া হু-হু এসে ধাঁধায় অতর্কিতে।

শান্ত সুদূর নীলে তারকায় ভরা
বছরের এই সবচে শীতল রাতে
মানুষ এখানে আপনি বসুন্ধরা
নারী রাখে প্রীত বাহু পুরুষের হাতে ॥

কথার মধ্যে

কথার মধ্যে অন্য কথা থাকে
থাকে উড়াল ডানা
একটু শাদা একটু-বা নীল বীথি
ধোঁয়ায় মিশাল নানা

ছবির মধ্যে অন্য ছায়া পড়ে
কাচের বাইরে ফ্রেমে
আলোআঁধারের কারুকার্যে চোখ
পড়েছি তার প্রেমে

ঠোঁটের উপর ভেজা মেঘের ছায়া
কেমন নানা রেখায়
রঙের মধ্যে রং হীনতায় রাঙা
দৃষ্টি খুলে দেখায়

তোমাকে ঢের কথার ছুরি দিয়ে
কেটেছি কুটি কুটি
এখন নতুন ডানায় হাওয়ায় ভর
ছুটি আমার ছুটি।

আমাদের মধ্যে

আমাদের মধ্যে একজন
বড়ো কোমল তার চোখ
মেঘের ওপারে অন্য মেঘ মিশাল নীল থেকে
আমাকে কখনো কখনো দেখে
অন্যসময় বড়ো বাদামী নাকি ঈষৎ পাটকিলে
তার চোখের তারা

সব ছুতোরদের ঘর থেকে
বাটালি র‍্যাঁদা আর করাত

সব কামারদের যন্ত্রশালা থেকে
হাতুড়ি নেহাই আর চিমটে
ছন্নছাড়াদের কাঁধের পুঁটুলি
আর হাতের লাঠি
সবই সম্বল ছিল আমার
এমন কি চিত্রকরপাড়ার
রংরেজের তুলি

আমাদের মধ্যে একজন
যার সবচেয়ে কোমল চোখ
কেন যেন আমার নৌকার পাড়ি মনে পড়িয়ে দেয়
চাঁদ ভাসানো নদীর মাঝ বরাবর

ঠোঁট খুললেই সব সূর্য চলে যায়
সমুদ্রের ওপারে
তখন দুটি নক্ষত্র তার দুটি কানে
শরীর থেকে উঠে আসে ভেজা মাটি রঞ্জন
আর দেওদার-চেরাই গন্ধ
আমি তখন আস্তে তার হাতে হাত রাখি
মণিবন্ধে ঝিকমিক করে ঘড়ির ডায়াল
আর দিগন্তে উল্কাচ্ছ্বসিত বলয়
আমার চোখে পলক পড়েনা

দেয়ালে ঝোলানো আমার ছবির এপারে
ফ্রেমের কাচে তার নিঃশ্বাস
বনরসগন্ধ ভরা অপার পৃথিবী তার পায়ে পায়ে নাছোড়

অনেক দেখার
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখার আয়না
    মাথার উপরে মস্ত নীল আকাশ
    একসময় ঝাপসা হয়ে যায়
অথচ আমাকেই সে দেখে
    স্থির অপলক পরিবর্তনহীন এক মুখ।

দেবীপক্ষে

যুদ্ধহীন বীতশান্তি, সংঘর্ষ ও স্বস্তিহীন দুর্দিনের আপাত বাসর
যদি চোখে চোখ রাখো শিরায় জঙ্গলে ডালে লতায় পাতায় চুনি
                                        এখানে ওখানে ঝলমলায়
প্রয়োজনে দৌড়ে আসা চৈত্রঝড়ও সহ্য করা যাবে।
আর প্রতারণা সয়না, হয় তুমি মৃত্যু হও,
নয় ছিঁড়ে ওড়াও হাওয়ায় ইশতেহার

নিঃশব্দে শিশির ঝরলো, সবুজ পাতায় ছিল সরল প্রত্যাশা
নখ থেকে উঠে গেল নীলিমা সুদূর নভলোকে,
ভালোবাসা মুহূর্তটি হাতের তালুতে ছিল কাঠকয়লার লাল,
ঘোড়াগুলি কেবলই পা ঠুকছিল ঠমকে স্টলে
    পায়ের পেশীর ঢেউ খেলায়
এবং দেয়ালে উঠলো হাঁ-মুখ ফাটল বেয়ে বিছা
এবং দারুণ দ্রুত পলেস্তারা খসে ঝরলো মুখ ও জিহ্বায়

সমুদ্রের পার ঘেষে ভাঙা জাঙ্ক ওল্টানো বয়ার
    পাশ ঘেঁষে বৃদ্ধ বাবা চলেছেন একা
কাঁধে ব্যাগ, কতদূরে কোথাও মন্দিরে যান,
    ফুলেগন্ধে চন্দনে আবৃত যাঁর নিষ্করুণ দেবী,

ছেলে বসে আছে নীল ফেনাপুঞ্জে ঢেউ গোনা নিয়ে
কাঁধে ঝুঁকে হাঁটুভেঙে খাটো চুল হাসিমুখ তরুণী বান্ধবী
স্কার্ট চুঁয়ে স্তন ছুঁয়ে উঠে আসে যে কস্তুরী,
সে কী তারও আন্তর সুবাস

পিতাপুত্র দুজনেই দু-দেবীকে নিয়ে স্বপ্ন
স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে জীবনের খড়্গে পা চলেছে
সে কী নারীর অমোঘ জাগরণে

ঘোড়াগুলি কেবলই পা ঠোকে যাবে বলে
ঠমকে পায়ের পেশী আস্তাবলে একই স্টলে
শুধু ঢেউ খেলায়,
কেবলই সমুদ্র, আর পারে ধীর পায়ে হাঁটা
অথবা কেবলই বসে থাকা ॥

পাবলো নেরুদার দুটি কবিতা

১.

দুটি ডানা,
একটি বেহালা
এবং এমনি বহু কিছু,
সংখ্যাতীত বহু কিছু, নামহীন বহু কিছু
একটি অত্যন্ত ধীরে সরে যাওয়া
টানা টানা চোখের প্রতীক্ষ অনুমতি
কাগজি বাদাম গাছে নখে লেখা
প্রত্নলিপি, আর
ঘাসের পদবীগুলি প্রভাতবেলায়।

২.

ওরা এখন আমাকে শান্তিতে রেখে গেছে
এখন ওরা আমার অনুপস্থিতিতে
রপ্ত হয়ে উঠেছে

এইবার আমি আমার চোখ দুটি মুদব

আমি কেবল পাঁচটি জিনিস চাই
পাঁচটি বাছাই করা শিকড়

তার একটি অশেষ ভালোবাসা

দুনম্বরটি হলো শরৎকাল দেখতে পাওয়া
আমি পাতা ছাড়া বাঁচবো কেমন করে
উড়ছে, মাটিতে ঝরে পড়ছে যে পাতা

তিসরা নম্বরটি হলো গোমরা মুখ শীত
বৃষ্টি আমি ভালোবেসেছি, কর্কশ শীতে
আগুনের আদরে চুমোয়

চতুর্থটি হলো গ্রীষ্মকাল
তরমুজের মতো পুরুষ্টু

আর পঞ্চমত, তোমার দুটি চোখ,
মাতিলদা, প্রিয়তমা আমার,
তোমার দুটি চোখ ছাড়া আমি ঘুমোবো না

তোমার চোখের চাউনির মধ্যে ছাড়া
আমি বাঁচবো না

আমি যে বসন্তঋতুকে তোমারই জন্যে
ঠিকঠাক সাজিয়ে দিই
আমাকেই দুটি চোখে অনুসরণ করতে

ঐটুকু, বন্ধুগণ, আমি যে টুকু চাই
কিছু না পাওয়ার মতো, অথচ
প্রতিটি বিষয়ই পাওয়ার যা কাছাকাছি

তবে ওরা যদি চায়,
যাক, চলে যাক।

সর্বনাশ ও সর্বস্ব

১

নদীধারা বুঁজে যায় শব্দহীন পলিপাতে ধীর
অমন বকুলগুলি তবু ফোটে তবু ঝরে যায়
যেন পাহাড়ের কোনো নির্জন ফাটলে পা রেখেছে
কোমল বালক বীজ, অনিবার্য শিকড় চারিয়ে
পাথরে গুঁড়িয়ে তোলে জীবধাত্রী সম্ভাবনা মাটি
শুধু ঐ ফুটে ওঠা শুধু ঐ ঝরে যাওয়া নিয়ে
অমন বকুলগুলি ধরেছিলে তরুণী শরীরে

কেমন কপালে বাঁকা চাঁদ ছিল, জেদী বাঁকা ঘাড়ে
অহঙ্কারী কেশর উড়িয়ে ঘোড়া, ঠমকে দুপায়ে
কখনো হরিণী, তৃপ্ত বাঘিনী-বা থাবার আয়নায়
সমস্ত অরণ্য স্বপ্ন চেটে নেওয়া দৃষ্টির জিহ্বায়,

এবং শিকার ছিলে পিপাসার ত্রস্ত সরোবরে,
সব ফুল সব লাজাঞ্জলি সব সাক্ষ্য ও স্বাহায়
কোমল ঘাড়ের মেঝে ধরেছিল অমল গ্রীবাকে
ধীর জরায়নে সেই কপালে ক্রমশ রেখাগুলি
নাভি থেকে উঠে এসে স্থান নেয় ভ্রূরেখার কোণে।

২

গোলাপ ও গন্ধরাজ ফুটেছিল চিবুকে গ্রীবায়
রজনীগন্ধার শান্ত স্নিগ্ধতায় ধরেছ শরীর
নদী এনেছিল ঢল, শিকড় শ্যামল এনেছিল
পুঞ্জ পুঞ্জ রেখা নিয়ে তৃণগুল্ম ফেটেছিল ত্বকে
রাত্রির নদীতে ঢেউয়ে ঝিকিমিকি দু'চোখ আকাশ
তরঙ্গ স্পন্দনে জ্যোৎস্না ভেঙে যাওয়া দীঘির নির্জনে
তুমি পৃথিবীর মতো সসাগর অরণ্য পর্বত
শ্যামল মেখলা ঘেরা, পুরুষের বুকে পা রেখেছ

এখনো তোমারি জন্যে বুকের ভিতরে মেঘ ফেটে
বিদ্যুৎচকিত হিংসা, অস্তিত্বের কোষে রক্তপাত,
যেন ঝড়ে ব্রেকার বিস্ফার শেষে দীর্ঘ বেলাভূমি
বলো অনিবার্য তুমি, বলো তুমি মৃত্যু ও জীবন
মায়া ও ঘৃণায় হিংস্র পুরুষের প্রথম রমণী!

৩

কতো ফুল কত রং বা সুগন্ধ পুরাতনী দেশ
নোনাধরা ভেজা শ্যাওলা ধরা ইঁট সব স্মৃতি জানে,
কোমরে ধনুক বাহুলতা নারী হরপ্পার ছাঁদে

হাঁটুর সামান্য নীচে পাড়, বাংলা ঢঙে শাড়ি পড়া
আমের মুকুল চোঁয়া ভেজা পথে পা ফেলে দাঁড়াও
কাঁকালে কলস, গায়ে অতসী পারুল গন্ধ,
এই খোড়ো দাওয়ায় চরণচক্র আঁকা ভেজা ছাপ,
কত ফুল তৃণলতা শ্যামলে সুগন্ধে পলিমাটি।

৪

নৌকাগুলি তীর ছেড়ে চলে গেছে, এখন জলের
উপরে ক্বচিৎ সূর্য ঝিকিমিকি বা চাঁদের গুঁড়ো
ঠিক এইখানে তুমি পা দিয়ে উঠেছ এই ঘরে,
এখন বাঁশের বাতা বাখারি বাঁকানো কোনোখানে
বুকের পাঁজরে কোনো আচ্ছাদন খুঁজে নিতে চায়,
হিমালয় নন্দিনীকে ভিখারিণী সাজালে, ভিখারী,
কত ফুল কত রং অপরাজিতার আকুঞ্চনে
কোনো অন্তবালে ঢুকে যায় সেই অদৃশ্য ভূগোল।

৫

চক্রে ঘুরে ঘুরে পাতা হাওয়ার চিৎকারে খসে পড়ে
কিছু লাল কিছু হলদে—যা ঝরে যা, সবুজ ছড়াক,
ক্রমশ মাটির দিকে ঘোর টান উল্টেপাল্টে ঘুরে
মাঠের যেখানে মাটি গুঁড়ো ছড়িয়ে হাঁপাচ্ছে সে দিকে
দৌড়ে চলে গেল তারা, ঘুম আসে, নিঘুর্ম বৈশাখে।
ঢাক বাজায় দূরে দূরে গাজন গম্ভীর, যা হাওয়ায়
ওঠা পড়ায় ঢেউ স্পষ্ট-অস্পষ্টে বিকল্প হয়ে আসে।
সুন্দরী মাধবী লতা খুন-খারাবী রঙের আকাশ

নধর সবুজ শাড়ি কোমর ছাপিয়ে উঠে যায়
যেখানে পাতার ফাঁকে আলো ঢুলে দোলায় ছায়াকে
বালিমাখানো কাদা অল্প বৃষ্টিপাতে মাখামাখি ঘাস।
চৈত্রে ঘুরে ঘুরে পাতা বুকের আকাশ ভেঙে নামে
এমন আরেক নামা জানা ছিল শ্রাবণের মেঘে
প্রফুল্ল কদম্ববনে নেমেছিল ঘননীল ছায়া
চৈত্রে ঘুরে ঘুরে পাতা এখন বিষাদে ঝরে যায়।

৬

টেবিলে রয়েছে বই শান্ত শুয়ে নানান গড়ন
কেউ লাল বা ধবল, কেউ উগ্র, সঙ্কুচিত কেউ,
বাবুদের বাড়ি এসে গ্রাম থেকে যেমন তরুণী
শহুরে বধূকে দেখে কৌতুকে ঈর্ষায় সেই মতো।
কিছু বই, বড়ো বেশি তার্কিক কেবলই কথা বলে
কে যেন বউয়ের মতো বড়ো চেনা হয়েও তবুও
জানা হয় না, সব খোলা, তবু তার আলস্য প্রহর
কেটেও কাটেনা, আর একা ঐ নির্বিকার ভিড়
দেখি দূর থেকে, ওরা কেউ নাকি আমারই আপন।
ওহে শব্দ ওহে স্বাদ ওহে এই দীর্ঘশ্বাস মোড়া
কে রয়েছ প্রতীক্ষায়, সে কী সাপ শুয়ে ঘাস বনে।
ঐ তো পিরিচে এক পাশে বসে পানীয়বিহীন
একাকী পেয়ালা শাদা করুণ হাতল খুলে স্থির,
সে কী এই নিসর্গের এক কোণে দাঁড়ানো জীবন,
যার সব চলে গেছে, ঝরে যায়, যেমন বকুল,
এমনকি মেঘের মতো, সব মূক বাচালের ভিড়ে

শব্দে শব্দহীন থাকা, উচ্ছিষ্ট ও নষ্ট বড় একা,
যখন রমণী দেখি, দেখি তার মণিবন্ধে বাঁকা
কোমরে করুণ হাত, কে দাঁড়িয়ে থাকো, কে, জীবন?

৭

দক্ষিণ বাতাসে ছিল ছিন্ন ভিন্ন মেঘের বুরুজ
কত না কৌতুক জানো এমন বসন্তদিনে হাওয়া
ফাগুয়ারা হৈ হৈ পথের দিশা জানে কি জানে না
হঠাৎ ঘনিয়ে এলো বড়ো বড়ো ফোঁটায় যন্ত্রণা
সমস্ত মাধবী বন উপড়ে দৌড়ে চলে গেল ঝড়।
তবু এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে যায় ঝরে
মুকুলও, তরুণ করবী তার সঙ্গ নিতে চায়,
দোলের পূর্ণিমা ঢেকে দিয়েছিল মেঘে সমাবেশ,
ফুটপাত্ত ছাপিয়ে উঠলো ছন্নছাড়া সংসারের হাল,
দক্ষিণ বাতাসে ছিল ছিন্ন ভিন্ন মেঘ, কি কৌতুক
জানো তুমি কে বসন্তী যুঁই ঝাড়ে বড়ো অশ্রু ফোঁটা।
একা ঘরে সারাদিন পা ফেলে পা ফেলে হাঁটা হাঁটি
দক্ষিণ বাতাস তুমি ধরেছিলে শীতের বল্লম,
ফুল ফোটা নয়, ফুল ঝরানোর আক্রমণ হয়ে।
ত্বকে বিঁধে যায় বিষ এবং রক্তের ঢের নীচে
নৌকাগুলি কেন যেন ছেঁড়া পাল, তবু ভেসে যায়,
ত্রিকোণ একাকী পালে হাওয়া ধরে কাত নৌকাগুলি
দক্ষিণ সমুদ্রে দ্রুত চলে যাচ্ছে বাইরে দরিয়ায়॥

৮

সমস্তই স্বাদ গন্ধ, এই ট্রাম ঐ দূর্বাঘাস,
এমনকি মেঘের কালো চিরে ছুরি একাকী যে বক,
শুদ্ধ, কিন্তু অনিশ্চিত জীবনে যে বাঁচে, প্রতি পায়ে
ক্রমে ঘাস-বীজ বেঁধে, যে বীজ উড়াল অন্য মাঠে।
আর ধীরে উন্মোচন দেহ থেকে এমন সুষমা
যার স্বাদ হাওয়া জানে, মেঘ জানে, বৃষ্টিপাত জানে,
এবং পুরুষও জানে সেই আর্দ্র কাঁসারঙা মুখ
যেন সে শিশির ধোয়া, যেন ঢের প্রতীক্ষার পর
আলুলিত কাশফুল, কারুকার্য ধবল উষ্ণীষ।
সমস্তই স্বাদ তবু জিহ্বা নয়, সমস্ত শরীর
ঘ্রাণকোষ বীজকোষ গন্ধকোষ দৃষ্টি স্পর্শ ত্বক
বিপুল পাতাল থেকে অন্ধকার স্বাদমূল থেকে
দীর্ঘবাহু তুলে উঠে আসে : বৃক্ষলতা
কেবলই ফাটায় শিরা, রক্তময় শিরাস্ফোটগুলি,
চন্দন রঞ্জন, ঐ দেওদার পাইন, ধূপময়
নৃত্যে পদপাতে দোলে, ঘোরায় আলুল বেণী,
সমুদ্রের কষা স্বাদ, লবণ এবং উতরোল,
পাহাড়ের খাঁজে বসা গাঙচিলের ঠোঁটে
আদুরে বালক হয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠে
ডুব দেয় স্বাদ গন্ধে, দৃশ্যরস রঞ্জনে লবণে॥

৯

সর্বনাশ ও সর্বস্ব আলিঙ্গনে বেঁধেছি আমিও,
সে কি বালুঘড়ি থেকে ঝরে যাওয়া আয়ু ঝরে যাওয়া,
তিরিশ বছর এই রঙ্গে রঙ্গিনীর সঙ্গে আছি—
পাতা খসে পাতা জন্মে, কিশলয় স্তবকে বিকচ,
ঝড়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়, বৃষ্টিপাত শেষে ফের নীল।
কেমন প্রতিমা হয়ে ওঠে গাছ প্রথম বর্ষণে
ঘন প্রতীক্ষায় হাল্কা সবুজে পাতা বনে বনে ঘোর
বাহুভঙ্গে ডালপালা নৃত্যপর তরুণী ওড়িসী,
প্রলয় পয়োধি তলে কে ঈশ্বর ধরেছেন বেদ
সব সর্বনাশ একই সর্বস্বে মৃত্তিকা হয়ে ওঠে।

চাই সেই বনফুল অঞ্জলিতে দাও ঝরে যাওয়া
তারপর বনগন্ধে চর্চিত ললাটে ভস্ম জমে,
না কি ধূলা ঝিকিমিকি পথে রৌদ্রে মধ্যাহ্নবেলায়
অথবা শিশির ঘাসে যা শুকোয় সামান্য আতপে।
তিরিশ বছর সেই রঙ্গিনীর সঙ্গে সঙ্গে আছি,
কোনো রাত্রি আলিঙ্গনে, কোনো ভোরে বাসী পিষ্ট ফুল,
এমনি করেই দিন যাপনের উড়ন্ত পতাকা
জ্বলে যায়, রং চটে, প্রতিমার কোমল দু গালে
ক্রমশঃ দু ফোঁটা জল শুকিয়ে মলিন দাগ রাখে,

সর্বস্বের দাবি বুকে, সে আমার ঘোর সর্বনাশ ॥

স্বদেশে-বিদেশে

নদীর ধারালো বাঁকা ছুরি, রাত্রি আলোয় আলোয় ঝলমলায়,
"...আমরা-তো নুয়ে পড়িনি, মহাদেশপ্রাণ যুদ্ধ শেষ,
পুরুষ ফিরেছে তার কারখানায়, আর
নারী ফিরেছে শস্যরিক্ত মাঠে,
শহীদ পুরুষ শিশু রমণীর গণসমাধিকে ঘিরে
ধ্বস্ত শহরের কোলে ফুটে উঠেছে প্রথম লাইলাক,
অক্লান্ত মৌমাছি হাত ট্যাঙ্ক থেকে ফিতা খুলে
পরাচ্ছে ট্রাক্টরে
রক্তমেদমাংস হাড়ে দু-কোটি মানুষ মাটি
অনেক উর্বর করে গেছে

"...আমরা-তো নুয়ে পড়িনি, পৃথিবী দেখুক
ভগ্নস্তূপের মধ্যেও
পার্টি বললেন 'গড়ো দর্শনীয় আবাসন, শহর, কারখানা'
সারাদেশ গলা মেলালো 'গড়ো'—
ঘাড় তুলে উঠে দাঁড়ালো আকাশ বেঁধানো বাড়ি,
লেনিন পাহাড়ে বিশ্ববিদ্যালয়...
সে-যে কি দুঃখের দিন, সে-যে কি সুখের ঋতু
১৯৪৫ মে-র গ্রীষ্মে অফুরন্ত সবুজ পাতার সমারোহ,
যাকে বলে পবিত্র রাশিযা,
যার সন্তানের করোটি কঙ্কাল মাটি হতে হতে
ফুটিয়ে তোলে ফুল ও ফসল"
আমি দেখছি মস্কভা নদীর কালো জলে আলো চমকে উঠে
ঘূর্ণি-নাভিগুলি,
রাত্রি নামছে দীর্ঘ বিকেলের পরে পায়ে জড়িয়ে আলোর পায়েল

"ওকি আপনি কি ভাবছেন," অন্যমনে হুঁ-জানাই
"মনে হচ্ছে দূরমনস্ক, মনে মনে কোথাও ঘুরছেন?"

ডাঙায় ভিড়েছে নৌকা
বাঁকা পিঠ মানুষের মাথায় তৈজস,
চ্যাটালো পায়ের তলে চটচটে কাদায় পথ ভাঙছে বঙ্গ-
গৌড়-কানসোনা—
খানাখন্দ বালি ··দূরে স্টিমার ঘাটের বাতি
মহাজন ব্যাপারীর ওজন পাল্লায় দোলে ভাগ্য হয়ে
বাঘের জঙ্গল কাটা মধু, মোম, মাছ
মহাজন সুদ কেটে মানুষের জীবনের মূল্য গুনে দেয়
পায়ে গুলো, জোঁক ও খরিশ ফণা চেপে ঘরে ফিরে যায়
আমাদের দিনরাত্রিগুলি,
একেকটা ক্ষুধার ঋতু, যেন যুদ্ধ, পার হলে,
কাঁধে বয়ে আদিম কামান, সেই লাঙল-জোয়াল
নদীর কুটিল লোনা বরাবর চলে যাওয়া নাবাল মাটিতে,
ভাঙা শালতি সেঁচতে সেঁচতে নেমে যাওয়া অনেক ভাটিতে
দক্ষিণ দুয়ারে কোন দেবতার, কে জানে, কেবল
পশ্চিমী টুরিস্টদের প্রিয় ফোটোগ্রাফ হয়
শীর্ণস্তন জননীর কোলে ন্যাংটো খোকা
রাস্তায় অঞ্জলিপাতা চাষী বৌ, স্টক এক্সেচঞ্জে ক্রুদ্ধ ষাঁড়,
ময়দান ও ব্রিগেডে হুঙ্কার···

'একি আপনি কি ভাবছেন,' অন্যমনে হুঁ জানাই
'মনে হচ্ছে দূরমনস্ক, মনে মনে কোথায় ঘুরছেন?'

মস্কোর প্রথম সন্ধ্যা বড় স্বাদু বড় অপরূপ ঠেকে,
কেবল নিজেরই বুকে রক্ত ঝরে, তবু রক্ত ঝরে,
কলকাতার বিদ্যুৎ বিহীন জুন হা-হা করে
নিষ্কর্মা কারখানা থেকে দৌড়ে চলে আসে

২

"এককোটি সত্তর লক্ষ আমাদের জনসংখ্যা,
যুদ্ধ শেষ···মাঠে নেই ফসল, কারখানা চুপ, বাড়িঘরও ভগ্নদশা।
বাস্তুবিদ, যন্ত্রবিদ সবাই মিছিল করে চলে গেল
সম্ভাবিত সচ্ছল পশ্চিমে,
স্কুলেও শিক্ষক নেই, চাষাভুষো মজুর ও ক্ষুধা
ফাঁকা হাত যন্ত্রহীন, কালো মাটি খাঁ খাঁ
হঠাৎ শহরে ভাঙা অপেরা হাউসে রং-কলি পড়লো
রাস্তায় প্রত্যেক মোড়ে প্রাচীর পত্রের ঘটা
নাটক দেখানো হবে অমুক তারিখে
লালফৌজের ভিয়েনের সামনে লম্বা রুটির লাইন,
রসুই থেকে ঘন স্যুপ বাঁটা হচ্ছে হাজার বাটিতে
চোরাগোপ্তা হিটলার ইয়ুথদের গুলি আর জঘন্য ফিসফাস
তারি মধ্যে ছেঁড়া কোট শূন্য পেট ক্ষুধা ঠেকাতে
নাটকে দর্শক বনে যাওয়া
কিছু লাল ফৌজী সৈন্য, নার্স, মস্কো থেকে আসা
অভিনেতা-অভিনেত্রী
কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে বেঁচে ফেরা নাট্যকার, নটনটী,
ক্ষুধা যন্ত্রণার মধ্যে অভিনয় করে যান

…মাঠে ফসলের ডাকে সমাজতন্ত্রের ছবি…
দুঃখী মানুষের হাতে রাষ্ট্র চালানোর চাবি…
এমনকি গ্যেটে, শেক্সপীয়ার …
এমনি দিনে ব্রেখট এসে বার্লিনার অ্যাসেম্বলে হাল ধরেছেন ·”
দেখছি
আলোয় ঝকমকে সন্ধ্যা, তরুণেরা রাস্তা পায় হয়, সঙ্গে
সুঠাম তরুণী, প্র্যাম ঠেলে যায় যুবতী মা,
দুপাশে ধক্‌ধক্ বুক ট্যাক্সি, বাস থেমে আছে,
…ওরা কোন ভাবিকালে যায়…
“ওকি আপনি দূর-মনস্ক, মনে হচ্ছে শুনছেন না কিছুই”
চমকে উঠে লজ্জা পাই, ‘না শুনছিতো’ বলে হাসি, দেখতে পাচ্ছি
ব্যারেজের জলোচ্ছ্বাসে শিশুদের করতালি, শুনতে পাচ্ছি,
ওরা নাকি যাবে ধূ-ধূ মাঠে,
অথচ বাঁকুড়া থেকে দৌড়ে আসে বাবলা বন, কর্কশ কশার ঝোপ,
অথচ কেবলই বন্যা খরা আর খরা বন্যা আবর্তনে ঘোরে,
ঠিকাদার চোখ ঠারছে কামিন তন্বীর দিকে, আর
পড়ন্ত বেলায় পথে যুবতীর সামনে নীচু গলা
যুবককে বলতে শুনি ‘… আরেকটু অপেক্ষা করো,
যে কোনো একটা কাজ…’
এবং উত্তর শুনি অশ্রুমুখী…‘কতকাল, কত দীর্ঘ কাল’…

হে আমার স্বদেশ সময়, আমি
অপরের সুখ দেখলে শান্তি পাই না, কেবল একটিই মুখ
স্বদেশে বিদেশে দেখি
দীঘল চোখের কোলে অন্ধকার আমারি ঘরণী হয়ে
পা ছড়িয়ে সন্ধ্যা বসে আছে

আ সমাজতন্ত্র, বসে থাকি শুনি বিশ্বময় মৌমাছির অলোকগুঞ্জন
ট্রাক্টর···মেসিন···শিল্প···বিশ্ববিদ্যালয়
রমণী ও শিশু, ফুল, নন্দিত মে-দিনে ছুটি—
হে বিদেশে স্বদেশ আমার
যে আমার স্বদেশে বিদেশ ॥

যা অনভিপ্রেত

যা অনভিপ্রেত, তাও ঘটে, ঘটে যায়, সম্ভবত
জীবন এমনি বাঁকা পথ নেয়, এমন কি স্পষ্টত
সোজা ও সরল পথ থাকতে, যেন খুঁজে পেতে চায়
অচেনা আতুর পথে ঘাস ফুল উৎরাই-চরাই।
উৎসবের দিনে কারো ম্লান মুখ—প্রিয়জন তার
নানা আতিশয্যে সেজে মুখ ফিরিয়ে ইন্দ্রানী অচেনা,
জীবন এমনই বাঁক আপনার দুঃখ খুঁজে নেয়
জীবন এমনই সুখ, স্বনির্বাচিত যা বিষাদ।
এমনই বোধের মধ্যে নিত্য ঘুরিফিরি, যেন রাত
ঘনিয়েছে, ঘরে ফিরতে হবে ঘুর পথে---
যে পথের ঠিকানাও ঠিক জানা নেই, পথে কেউ
নেই বলে শুধাবারো সুযোগ মেলেনা, একা দেখা
দু ধারে ঘুমন্ত বাড়ি, খাঁ খাঁ রাস্তা আলো জ্বালিয়ে আছে,
--যাবে, যাও—চেনা জানা ঘটেনা রাস্তারও।
কোথাও যাবার জন্যে কবে যেন ঘর ছেড়েছিলাম
উদ্দেশ ঠিকানাহীন, শুধু পথে বৃষ্টি বালু ঝড়
ফুল ফোটা ফুল ঝরা

শাড়ি-গাউনে কাদের ঘরণী
ঘরে ফিরছে নিজেদের, কাদের শিশুরা পার্কে খেলে
সে নারী কি আমার রমণী কিংবা ঐ শিশুরাও
আমার শোণিত ধারা বইতে পারতো
এত সব ভেবে
কেবল যা চাইনা তারই সঙ্গে বসবাস, সে কী পাপ,
কি জানি রহস্য প্রশ্ন তুলে ধরে, যাবে কোথা, যাও।

চিতা শঙ্খচিল

চিতা শঙ্খচিল তুই-ই একাকীত্ব ঘনায় আমার,
ঐ দীর্ঘ কোমলে ইস্পাতে পেশী পিস্টনের নিয়মে সুন্দর,
কেউ তাকে রূপ দেয়নি, কেবল প্রকৃতি দীর্ঘ ব্রতে
হিংস্র মহিমায় তাকে সুন্দর করেছে, যে সুন্দর
পাতার আড়াল থেকে অব্যর্থ টঙ্কারে রক্ত চাখে।
ত্মাখো স্থিরস্রোতা নদী, জেলের লগার পরে বসে
বাদামি ও শাদা এক শঙ্খচিল একা অশ্রু বোনে,
দুপুরে হলুদ রোদ কাশবনে হেলায় শুভ্রতা
সুদূর বিষাদ শুধু হাওয়ায় চক্কর দিয়ে ফেরে—
ঐ হাওয়া বাঁকা ঠোঁটে অভিজাত বিতৃষ্ণা দিয়েছে
নীলে-যে ভাসন্ত শাদা মেঘ তাকে তাচ্ছিল্য শেখায়
স্পর্ধার মহিমা তাকে একাকীর সম্ভ্রমে সাজায়।
যতই বয়স বাড়ে শিরাগুলি পত্রপুঞ্জে শাখা,
অদৃশ্য একক চিতা, থাবা মুড়ে ঘুমায় যেখানে,
অশ্রুহীন করুণতা হাওয়ায় হাওয়ায় ঘুরে যায়

গলায় বাষ্পের মধ্যে চাপা থাকে তীক্ষ্ণ শব্দ চিল।
কোন এক মাটি থেকে উঠে আসা অনিবার্য বোধ
সব তৈজসের মধ্যে, সব দৈনন্দিন উপেক্ষার
অথবা সম্মান, কিংবা সম্ভ্রমবোধের মধ্যে ধীরে
শক্ত এক গুঁড়ি চিরে ঢুকে যায় হিংস্র ঘুনপোকা।

কে-যে প্রতিপক্ষ

কে-যে প্রতিপক্ষ ছিল, কে-যে ছিল স্বজন আত্মীয়
ভুল হয়ে যায় মনে, মন কৃষিকাজও শিখলে না,
এমন জমিন ছিল ধান আর আগাছার বীজে
এখন দু'দল মিলে জড়াজড়ি নিড়ানো কঠিন।
অশ্রুমতী বালিকার মনে পড়ে গ্রামের বউল,
জানলায় দাঁড়িয়ে একা কলকাতার গলি দেখে ভাবে
—এমন দুঃখের মধ্যে মানুষজনের বসবাস
এর চেয়ে ঢের ভালো বন্যা ঝড়ে ত্রস্ত দেশ ভুঁই—
কে-যে কার প্রতিপক্ষ, এখনো কেমন যেন ধাঁধা।
স্বজন নির্জন নয়, বড় বেশী হুঙ্কার জাগায়,
পরজন গলবস্ত্র দাওয়ায় আসন পেতে ডাকে
আসনের রংবাহার মনে পড়ায়···বোসো কিছুক্ষণ
তারপর তোলা রব অন্য কারো প্রতীক্ষ মাচায়।
মানব জমিন শুধু খাঁ খাঁ থাকে, খাঁ খাঁ থেকে যায়
স্বজন চিৎকার করে, বড়ো বেশী অশ্লীল চিৎকার,
মনে হয়, অন্য কোনো দাবি নিয়ে বুকে চেপে বসে
যে-দাবি পুরনে আমি এখনো আজব অক্ষমতা।

অশ্রু নয়, আত্মগ্লানি ধীরে ছায়া ছড়ায় চৌদিকে
অগ্নিস্থলি ঘিরে ঘিরে একদা আত্মীয় দল নাচে
লোহার ফলায় বেঁধা দেহ থেকে রক্ত ঝরছে ঐ
কে কাকে শিকার করে পোড়াচ্ছে সে নরখাদকেরা
হয়তো আমাকে তারা কাঁটাগুল্ম বিষলতা জেনে
এখন নিড়ানে দেখি প্রশ্রয় যোগায় কাস্তেটাকে ॥

বিচার সভায়

হাওয়ায় গোপন ফিসফাস, চেনা মানুষের চোখ
সপ্রশ্ন, এখন তবে দাঁড় করানো হবে আমাকেও
মঞ্চে···বলা হবে যাও যেখানে ঘূর্ণিতে ভস্ম ধূলা,
যাও হাড় করোটির কঙ্কালী মশানে বিস্মরণে।
পুরুষের বার দুই···ফুলের বাসরে ডাক পড়ে
বিবাহে মরণে, বীর দু-বার সে, জয় করে নেয়
রমণী আগুন, দুই-ই পুষ্পময় নন্দিত বিছানা—
দু-মেরুর মধ্যে শুধু বাকি দিন ধুলো পায়ে ভস্মগায়ে হাঁটা।

না, উঠে দাঁড়াই মঞ্চে, চেনা মুখ সপ্রশ্ন অচেনা
কারো চোখে খড়্গো বিস্ফুলিঙ্গ, কারো মেঘ,
কে-যে বিচারক, কার মনে বাজছে বলির বাজনায়
প্রাণহীন দেবী প্রতিমার সামনে নির্মম মহিমা,
ধুনো ও গুগগুলে হাওয়া ভারি হয়ে ওঠে মাদকতা—
হাত পাখায় প্রতিমার ঘাম তেলে পুরোহিত ক্লান্তি মুছে নেয়,
সে কী ক্লান্ত নিশ্চেতন মাটির পুতুল, শুধু বালি

শুকনো রক্ত কালো, সন্ধ্যারাগ ছোঁয় রাত্রির আঁধার ?

প্রাণহীনা, যার জন্যে নিজ হাতে বুকের বাঁদিক
ফাটিয়ে দিয়েছি রক্তজবা টাটে, এখন আমারও
বড়ো সাধ—যাই বিস্মৃতিতে, যাব মাটিতে যেখানে
শক্ত বীজ ফাটিয়ে জেগেছে বীজপত্র, ফুল স্তবকে ফুটেছে,
হাওয়ায় দোলায় মালা, তবু পা শিকড় শক্ত
প্রোথিত মাটিতে ॥

সুন্দর

সুন্দর, তোমার জন্যে সমস্ত জীবন বেঁচে থাকা
পথে ভাঙা কাচ কাঁটা, সন্ধিবাঁকে অতর্কিত ফণা
সব সহ্য করি, সব সইতে জানি, পদক্ষেপগুলি
দ্রুত কিংবা ধীর হয় সমস্ত জীবন, আজীবন

গাছের ডালের গিঁঠ আঙুলে আঙুলে জট বাঁধা
সে জাফরির মধ্যে দেখছি ঈশানে মেঘের বিস্ফোরণ
যেন নীহারিকা পুঞ্জ ফেটে ক্রুদ্ধ কেশরে আগুন
জীবনের সন্ধিবেলা এই অপরাহ্ন,
যেন মধ্যরাতে ভেসে আসা,
হাওয়ার ঢেউয়ের ওঠাপড়ায় গম্ভীর দূর ঢাক

সুন্দর, তোমার সঙ্গে দেখা হবেনা, কেননা তুমিও
অনিবার্য অতর্কিত বিদ্যুৎ চমকমাত্র

খাদের খাড়াইপাশে পা টলছে তোমারও
মুহূর্তের জন্যে দেখা, তারপর অন্ধকার, জানা হয় না—তুমি
কোথাও নিঃসাড়ে পড়ে যাচ্ছ, কিংবা পা ফেলে পা ফেলে
পাকদণ্ডী পথ বেয়ে উঠে যাচ্ছ পাহাড় চূড়ায়।

সময় হয়েছে, চলে যাও

কে তোমার পিছে হাত বাড়ায়
অন্ধ, তুমি আত্মাহীন নিয়ম তাড়িত দম্ভ ও অবধারিত জরা,
ভাবো আছে
এখনো উশখুশ তাপ শিরায় পেশীতে?
যাও, বৈশ্বানর ডাকে, মাটিতে কীটেরা ডাকে
সময় হয়েছে চলে যাও

পার্লামেণ্ট রাস্তা, নানা পতাকায় দূরে-দূরে কৌরব শিবির
প্যাটেল চকে ঢেউ ঠেকাতে লম্বা দড়ি আড়াআড়ি বাঁধা
বুকের মধ্যের আঁচ কিংবা আলো
কোন গিঁঠে বন্দী রাখা যায়?
যাও, বৈশ্বানর ডাকে, মাটিতে কীটেরা ডাকে
সময় হয়েছে যাও, যাও

হস্তিনাপুরীতে দুই অন্ধ
এক ধৃতরাষ্ট্র, অন্যজন জননী গান্ধারী
একজন জন্মের দায়ে, অন্যজন অন্তরের চোখে দেখবে বলে
একে বলেছিল 'জয়', অন্যে বলেছিল 'ধর্মে জয়'—

প্যাটেল চকের পথে ঢালে ও হেলমেটে
জন্মান্ধ রাজার হাতে অস্ত্র, আর
মুখোমুখি রক্তমাখা মাথা নিয়ে
স্বয়ং গান্ধারী

কে তোমার পিছে ছায়া
অন্ধ, তুমি আত্মাহীন নিয়মতাড়িত দম্ভ, রাজা,
তোমারই বাহুতে বাড়ে বিষলতা দুঃশাসন
গলায় জল্লাদ হাত বাড়ায়
ভাবো, আছে এখনো পেশীতে শিরায় উশখুশ তাপ ?

যাও, বৈশ্বানর ডাকে, কবরে কীটেরা ডাকে
সময় হয়েছে, চলে যাও ॥

চতুর্থ পেরেক

হয়তো এসব কথা মনোমত হবেনা সবার
মনে করিয়ে দিতে চাইছি তবু
সেই শ্রাবণতিমিরঘন মেঘপুঞ্জ বিদ্যুৎ বিস্তার
সদ্য স্নান সমাপনে পাতায় সুন্দরী গাছ
আমের মুকুল চোঁয়া মৌভেজানো পথ, কিংবা
চৈত্রে বনে বনে শাল সেগুনের ডালে ওড়ে সবুজ পতাকা
—এখন এমন বীতঋতুতে কুড়ুলে তারা শুয়েছে শহীদ

কে বলে তাদের কথা যারা ছিল স্বজন তোমারও
কেনানের সওদাগর কিনে নেয় সুন্দর যুসুফ

নক্ষত্রবালারা সূর্যগ্রহপুঞ্জ যার পায়ে হাঁটুভেঙে বসেছে একদা
ঘ্যাখো চতুর্দিকে মৃত সবীজ গাছের শব
ঘ্যাখো মায়েদের বুকে দাউদাউ আগুন
কে রণশিঙায় ডেকে পথ ভুলিয়ে শুইয়ে গেছে
গলিতে রাস্তার মোড়ে খেতের মূর্ছিত আলে
উৎসন্ন শিকড় শিশুশাল

প্রভু চলেছেন কাঁধে ক্রুশকাঠ গলগোথার দিকে
প্রভু চলেছেন
মুক্তি কাঁটার মুকুটে বিঁধে আছে
না, তোমারও মুক্তি নেই, যাও
সিংহের দাঁতের নীচে, ঘাতকের খড়্গের তলায়, যাও
-- প্রভুরই নির্দেশ

সব দিনগুলি বড়ো জানা ছিল
পথে নেমে এসেছিল ঘর
সব রাতগুলি বড়ো রহস্যমদির ছিল
পথ উঠে এসেছিল ঘরে
ঘর ও বাহির বয়ে একই স্রোত ছিল, যেন
নদী স্নিগ্ধ আঙুলে নিপুণ পলি তুলে এনেছে
যা শস্য ফলায়, ধানরমণীর শয্যায় বীজের স্বাদ দেয়
ভেজা মাটি গর্ভ বয়,

ঘর ও বাহিরে এত কাটাছেঁড়া কেন
দরাজ গলায় কই ভাইকে ডাকোনা ভাই বলে
ঘর-ছাড়া দিকহারা বালককে পথের না দিশা দিয়ে বলো

—যা বাঘ সাপের বনে, বিস্মরণে, বালকও তখনি
যেন পরিণত যুবা কাঁধে ধনু পিঠে তূণ চলে যায় বনান্তরে একা

কত বড়ো সমুদ্রের তেতো নোনা জল
ডাঙায় কেবলই এসে হাতড়ায় মাটির গুপ্তকোষ
সন্ধান মেলেনি বলে বারবার ঘাড় নামিয়ে ঢেউ ফিরে যায়
ফের আসে,

তুমি কি ভেবেছ এই মানুষজনের বাহু এখন নামানো বলে
আরেকবার আকাশ খুঁজবেনা
তুমি কি ভেবেছ গাছ ফল দিয়ে শব হলো বলে
আবার কি বীজ থেকে প্রাণের আনন্দে বীজপত্র খুলে
শ্যামলিমা উঠে দাঁড়াবেনা
তুমি ভাবছ শব থেকে দক্ষিণ বাতাস ছুঁয়ে
হেসে উঠছে বিবাহের রঙে রাঙা করতলে নন্দিত মেহেদী
ভুল ভুল, তীক্ষ্ণ চেরা জিহ্বা হয়ে সঘন শ্রাবণরাত্রি জমিয়ে রাখে
বারুদে বিদ্যুৎ

ত্যাখো, পিছে ঘুমে জাগরণে পায়ে পায়ে ফিরছে
অমোঘ তাড়না হয়ে চতুর্থ পেরেক ॥

দেবী

ঠিকতো আগুন নয়, যা পোড়ায়, যা লেহন করে
দাহ্য অদাহ্যের মধ্যে সাপের স্বভাবে, নাকি রাজা
এ-দুর্গে হৈ হৈ হানা ও-দুর্গে পরাস্ত পিছু ফেরা,
কিন্তু এও অন্য শিখা, অর্বুদ বর্শায় দৌড়ে আসা
বর্গি কিংবা হূণ, নাকি ভিয়েতনামে মার্কিনী নাপাম,

নাবালে নোয়ায় ধান, ডাঙায় শোয়ায় ভদ্রাসন,
বাংলার শরতে দেবী আগোড়ালি কেশপাশ খোলা
দাঁড়ান নগ্নিকা, যজ্ঞডুমুরের আল-বাঁধে ঘেরা
যজ্ঞস্থলি ধুয়ে দেয় তন্ত্রধার তরল আগুনে,
এবং মৃত্যুই নীল অপরাজিতায় বানভাসি
শবে ও মুখাবয়বে, শব সাধনায় ওঁ হ্রীং
বেতার-রোটারি-হেলিকপ্টারে বা পরিসংখ্যানের,
বাংলার উৎসাহী হাত কৌটাব ডমরু নিয়ে ঘোরে ··
যা খরায় শস্যে প্রাণ, বাংলার শরতে তাই খুনি

ঠিকতো আগুন নয়, শিশুর চোয়াল মাংস হাড়
মৌসুমে জাগাবে চারা, রমণীর ওষ্ঠাধর জানু
ফসলে উর্বর হবে যা মাটি মাটিতে মিশে গ'লে
সংসার— যা অর্থহীন অধ্যবসায়ের হাত ধরে
শৈশব কৈশোর থেকে মিছিলে ময়দানে চলে আসা,
ঘরে ফিরে বানভাসি ··আকাশে ঘনালে রক্তমেঘ,
এবং আগুন নয়, যা জীবন, সেওতো তবলই
রাশিরাশি ফেনপুঞ্জে দৌড়ে আসে নাবালে ডাঙায়
মনে হয় সেও বন্যা মানুষে মানুষে পতাকায়।
খরখড়্গা খট্ট পট্টে পাদপীঠে দাঁড়ান নগ্নিকা
ইস্পাত ধাতবে স্রোত লটপটায় শস্য ও শিশুকে
চাবশ্য ধুয়েছে বন্যা একমেটে দোমেটে কাঁচা রং
কাদা দিয়ে গড়া তুপা মহাকায়া মহাদেবী বামা
সন্ত্রস্ত এখনি পাছে ধরা পড়ে খড়ের কাঠামো
ঠিকতো আগুন নয়, অথচ আগুনই, শুধু জল
বিদ্যুৎ-চকিত থাবা, নাকি দাঁত, লেহন দহন ॥

শব্দ বিষয়ে

১

পাতাগুলি ঝরে সারা দিনমান ঝরে,
রোদ খেলা করে, আঙুল বুলায় পাতায়,
দিনগুলি ছিল, দিনগুলি ছিল ভরে
রূপোলি ধবল চ্ছুরণে গাছের মাথায়।
আমি পথে পথে হাঁটা ছেড়েছি সে কবে
ঘর ও বাহিরে পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকা,
ওহে গাছ, ঐ পাতা ঝরানোই হবে
জীবন যাপন, গড়াবে দিনের চাকা ?
পড়েছে রমণী পায়ের ধারালো নখে
আলতা, নাকি সে আমারই বুকের লাল,
প্রিয় হে, কতনা সুখস্মরণিকা চোখে
জল ভরে আনে, সেদিন বিগত কাল !
পাতাগুলি ঝরে, শুধু পাতাগুলি ঝরে,
রোদ চিরে দেয় শুকনো ত্বকের ফালি—
অদৃশ্য কোন শিখায় নৃত্য করে
শোণিতে শব্দে আগুনের করতালি।

২

সভাগুলি শুধু উতরোল আলোচনা
সবার কথাই অতি গুরুত্বময়
শব্দের পিঠে কেবলই শব্দ শোনা
শব্দ তবে কি শব্দবিনাশী হয় ?
মাথায় বিনুনি, তাতে ছিল সাদা ফুল

বালক বয়সে শব্দ ভাঙলো ঘর
মাঠে ছিল ঘাস, শিশিরে স্বচ্ছ তুল,
সুরের সঙ্গে সংগত সাত স্বর !
শব্দ, সে ছিল তরুণীর কালো চোখ
বুকের গোপনে রক্তের গর্জন,
শব্দ কখন স্মৃতিজাগানিয়া শ্লোক—
আতুর গন্ধে দেহে চন্দনবন ।
এখন শব্দ সভার বস্তু হয়—
শব্দ, শেখাও শব্দবিহীন হতে,
এত দাহ, কত শরীর বা মন সয়
শব্দ খোঁচায় আগুন গোপন ক্ষতে ।

৩

বুক কেঁপে ওঠে দাঁড়ালে অমন কাছে
নদীও কেমন বাঁকা প্রতীক্ষ ছুরি
জ্যোৎস্না ধবল স্খলিত তারার আঁচে,
আশরীর খেলে শব্দের লুকোচুরি ।
তরল আগুনে নদীর অকূল জ্বালা
শিরায় যে-কথা শাণিত স্পন্দমান
বড়ো ভয় হয়, পাছে দু ঠোঁটের তালা
খুলে দেখে নাও, শব্দ ছত্রখান ।
আমার দুঃখ, শব্দে জমেছে চড়া
শব্দের পিঠে শব্দতাড়িত বালি,
হায়রে, আমার অপার বসুন্ধরা
বুক ভাঙে দেখে শব্দের চোখে কালি,

ঠোঁট কেঁপে ওঠে, থাকি নিঃশ্বাস চাপা,
কে জানে কি পাখি জ্যোৎস্না জাগর গাছে,
শব্দ রে, আয় অতি সঙ্কোচ মাপা,
যদি যন্ত্রণা দাঁড়ালে অমন কাছে ॥

দয়া স্তোত্র

স্বপ্নের ভিতরে হাঁটছে হালকা পায়ে যেন জ্যোৎস্না তরুণ তরুণী
ঈশ্বর ওদের দয়া করো
দুঃখের আগুনে ওরা সুখ পোড়াবে মুখ পোড়াবে তরুণ তরুণী
দেবতা ওদের দয়া করো
ওরা চোখে দেখছে ঝোড়ো মেঘগুলি নেমে আসছে ফলময় শাখা
প্রকৃতি ওদেব দয়া করো
ওরা বুকে শুনছে শিশু শস্য কান্না কাজল আঁকা ও কাদামাখা
মানুষ ওদের দয়া করো

রমণীরা ঘরপাতার জন্যে কল্কা আলপনায় স্বপ্নে নড়ে চড়ে
দয়া করো প্রভু দয়া করো
ঘুমে জাগরণে ওরা চরাচর শরীরে রেখেছে ঘট ভরে
দয়া করো প্রভু দয়া করো
জ্যোৎস্না ঘন হয়ে ও-কে হাল্কা পায়ে শিয়রে সোনার চাবি রাখে
দয়া করো শম্ভু দয়া করো
স্বপ্নের ভিতরে সুখী ওরে দুঃখী তরুণ তরুণী প্রাণ চাখে
দয়া করো শ্রম দয়া করো

ঈশ্বর দেবতা হে মানুষ
দেবতা প্রকৃতি হে মানুষ
মানুষ মানুষ হে মানুষ
দয়া করো প্রভু দয়া করো

জল্লাদ

ভয় ভাঙাতে ঢের কথা বলেছি, এখন
আমারি বুকের মধ্যে ভয়
জয়ের দিগন্ত চিরে ট্রেন আসে ট্রেন চলে যায়
বে-লাইনে ঝমঝম সময়

এইতো ঘাড় নীচু শিরস্ত্রাণহীন বসি হাঁটু ভেঙে
চলে এসো জল্লাদ বয়স
এইতো বুকের মধ্যে ঢের বৃষ্টিপতনের মেঘ ঘোষণা:
বহু বেদনায় যা সরস

শিশিরে ভেজানো হাত সদ্য চষা মৃত্তিকার ওমে
আঙুল ডুবানো এক চাষী
সমস্ত জীবন শুধু প্রতীক্ষায় রয়ে যায়, মাটি
রয়ে যায় তারও পরবাসী

দাওয়ায় বসেছ একা পা মুড়ে রমণী
আসব বলে দোর খুললে নাকি
জাম জারুলের বনে কেবলই বাতাস বয়ে যাওয়া
পাল্লায় হাওয়ার শ্বাসে ফাঁকি

মাথা নীচু মাঠ ভেঙে আসব বলে তৈরি হয়ে আছি
চুলে রূপো বিলি দেয় চাঁদ
চামড়ার চিকন চিরে রোদের অলক্ষ্য ছুরি গেল
যা সুন্দর বাঁচার বিষাদ

ঘন অন্ধকারে শুধু কেঁপে ওঠে ঝিরি ঝিরি নদী
ঘাতকের মতো ঘাসবন
চলে আসে চলচ্ছবি চলে যায় জলছবিগুলি
জীবন জীবন আজীবন

নিয়তি নিয়তি।

নদীদের পাশে

ফুলের সভায় ডাক পড়েছে তোমার
নাকি বিবাহের রঙ, বা শবযাত্রা?
মনমোহিনী তুলনাহীনা নারী
সোহাগ সাধছে আগুন, হু হু আগুন
ছড়াচ্ছে খই, ফুল ছড়াচ্ছে পথে
দগুকলস মৌকুপি বেল যুঁই
যাদের বুকে সসঙ্কোচ ফোঁটায়
মধু জমেছে, মধু খেলায় চাঁদ
ঢেউয়ের তরল ফণা জটিল আগুন
এই নিশীথে ফুলবনে কোন ভ্রমর
পাঠিয়েছিলেন শচীন দেব বর্মন,
জয়সিংহের ধমনী ছিঁড়ে নদী
জলের গন্ধ পিষ্ট বুনো লতায়।

কি যে আমার হয় নদীদের পাশে
স্রোতের কোলে প্রায় উলঙ্গ আকাশ
উবুড় হয়ে হাত পা ধুয়ে নেয়
প্যাচাপলির কাদায় বা বুদ্বুদে
জলজ গ্যাস চোখ খোলে চোখ বোঁজে
শুনছি জলদ ঢেউয়ের আছড়ে পড়ায়
ছলাৎ ভারত ছলাৎ ভারত ছলাৎ

এমনি যেন ট্রেনের আঁকাবাঁকা
লাইন বদল ঘটলে শুনতে পাই
—কোথায় যাচ্ছ, যাচ্ছতো ঠিক পথে
কৃষ্ণা এবং কাবেরী পার হতে
গুম গুম সেই মন্ত্র শুনেছিলাম
যেমন ব্রহ্মপুত্র পাড়ি ব্রিজে
চাকায় ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ

নদীর ধারে আগুন চেলী গায়ে
তুলনাহীনা বনদুর্গা স্বদেশ।

উৎসর্গের পাতা

বইছাপা শেষ, শুধু উৎসর্গে ঠেকেছে, ভাবছি উৎসর্গে যে নাম—
বন্ধুর আস্তিনে ছুরি আলতো চোখে দেখতে দেখতে
এমন কি বাসের ভিড়ে হঠাৎ জানলায় দ্রুত গুলমোহরে, সৌখিন
গাছের খুসি এক ঝলক দেখতে দেখতে,
ট্রাফিক উদ্‌ভ্রান্ত পথে বাঘের জঙ্গলে মৌলি মৌমাছির পিছে ছুটছে

ভোকাট্টা ঘুড়িতে চোখ ফুটপাথের শিশু
যাই দেখতে দেখতে
—এসব কবিতা কার, বা কাদের জন্যে লিখে রাখি
মাঝে মধ্যে বুকে শিং বাইসন বিঁধিয়ে বসে বাঁকা চাঁদ থেকে,
মাঝে মধ্যে ময়দানের ঘাস দাপিয়ে পাটকল বা খনি থেকে
আমার ঈশ্বর হেঁটে যায়, আমি
অলক্ষ্যে মনের মধ্যে হাঁটুভেঙে বসি
মাঝে মধ্যে ট্রেনে দূরে সভা করতে গেলে দেখা শুকনো মাঠে কুশ
বেনার থোবা
এবং বর্ষার রাঙা জলে মাজা ভাঙা চাষী বৌ চারা বোনে—
এসবই কখনো ঘাড় ধরিয়ে অর্ধেক রাত্রে টেবিলে বসায়,
কিছু শব্দ গাঁথি, লিখি
সমস্ত জীবন কোনো আলেয়ার ভুতুরে লালের পিছে, অথবা
নিশির ডাকে
পোড়ো মাঠে আপন কঙ্কাল পায়ে বিঁধে হাঁটছি নাকি

ক্রমশ জুলফিতে পাক, পাতা ঝরে পড়া গাছ হই
এবং উদাস ধুলো কপালের খাঁজে দাঁড়ে বন্দী বুনো পাখি
ঘরে-বাইরে বাইরে-ঘরে চেনা মুখ আবার অজানা

উৎসর্গের পৃষ্ঠা ফাঁকা, যাদের কথাই ভেবে এতদিন লেখা-লেখা
সেই চাঁদ, সেই ব্রহ্মডাঙা চিরে ফণিমনসা ফুলের বিদ্যুৎ,
সেই মাঠ, ময়দানের খুশি মুখ ঘাস,
সেই এক আকাশ তারা
সাদা পাতা জুড়ে যেন অদৃশ্য লিখনে পড়ে আছে

শব্দগুলি স্বল্পজল কলসীতে বুকের মধ্যে কেবলই ছলাৎছল
কি শব্দ বাজায় ॥

ভারতবর্ষের পুব সমুদ্রে

ভারতবর্ষের পুবসমুদ্রে নানান হাওয়া এবং বন্দর,
ঘোলা বা কোমল নীল সবুজ ফিরোজামর মুন
এবং পুরুষদের পেশীতে স্পন্দিত বাজনা, ক্রেনের বহর,
কিংবা রমণীর চুলে সে হাওয়ায় আকুল আগুন।
দেখিনি কি, কেমন প্রবল থাবা মহাবলীপুরমে সৈকতে
আছড়ায় আনন্দে, কর্ণফুলী ঘোলা— নীলায় উর্মিল,
ভারতবর্ষের পুব সমুদ্রের শান্ত খাঁড়ি, তালতাল জলের পবতে
অপরূপ গিরিগ্রন্থি চরাই উৎরাই হয়ে বিস্তৃত সুনীল।
দ্যাখো সূর্য লাফ দিয়ে আকাশ মুঠোয় ধরতে উঠেছে আবির
দৌড়ের উৎসাহে ক্রমে গোল অবতলে ঝুলতে থাকে
এমনি উচ্চাশা বয় চাকার টায়ারে খাঁজখানি
যতই এগোয় তত পিছোয় ঢেউয়ের উচ্চাবচে সে অস্থির
গাড়ি চলে যায় আগে, পথ যায় বাঁক থেকে বাঁকে
কিন্তু সেই খাঁজ তার যা এগোনো, পিছনো সমানই।

নীলকণ্ঠ পাখির পালক

ঝুঁকে, আঙুলের ভাঁজে মনে পড়ছে কতদিন আগে
ধুলো থেকে নীলকণ্ঠ পাখির পালক তুলেছিলাম
শন্ শন্ হাওয়ার এলোমেলোতে এখন
বালক বেলার সেই বিস্ময়কে ছুঁতে গিয়ে দেখি
নদীগুলি মুখ থুবড়ে বালিতে কঙ্কাল
দেখছি, খাঁ খাঁ মাঝ আকাশই অর্থহীন নীল, পাখি নেই

প্রাসাদ আমারো নীল, হাওয়ার পাথর ইটে গড়া
ঐ দেউড়ি হাল্‌কা মেঘে খুলে যায়, কিংবা বন্ধ হয়,
স্তম্ভে বা কুট্টিমে তারা ঝিকমিকায় মাণিক্যের দ্যুতি
ঝুঁকে, আঙুলের ভাঁজে পাই নাকি নীলকণ্ঠ পাখির পালক—
তবু তাকে পেতে হয়
বুকের ভিতরে শিরাগুলি
প্রবল ঝর্ণায় শুধু নামছে নামছে, যার পাড়ে একা
বোলডারে চিবুকে হাত হাঁটুমুড়ে বসেছে তরুণী
অন্যমনে খেলা করে হাতে সেই নীলকণ্ঠ পাখির পালক,
ম্লান জ্যোৎস্না দেওদারের ঘাড় ছুঁয়ে কোমল করেছে তার গ্রীবা

শুধু স্মৃতি, গড়ে তোলা স্বপ্ন, নাকি সত্য নিয়ে বেঁচে আছি,
মানুষ এমনি সুখে বাঁচে॥

না প্রশ্নের কিছু নেই

না প্রশ্নের কিছু নেই, এ কেবলই বেঁচে থাকাটুকু,
অর্থাৎ জঞ্জাল গ্লানি, ক্লিষ্ট অন্ন, দীন আচ্ছাদন
এসব কিছুই নয় ; সমস্যা মনের বেঁচে থাকা,
পিছনে উদ্যত বাঘ সামনে খাদ পা টলছে হোঁচটে
মনে কি ঘনালো মেঘ শালবন ছুঁয়ে নীলাঞ্জন
মানবজমিন শুধু খরা অনাবৃষ্টি সয়ে যাবে ?
মনেরও ফসল চাই, মনই জানে মেঘ সঞ্চরণ
মনই আনে ফসলে সফল ঋতু উদ্ভিদ ওষধি।
কি প্রশ্ন শুধাও, নেই বাঁচার দুঃখেরো শেষ, তবু
বাঁচা বড়ো সৃষ্টিময়, সুখ, অনিবার্য অনুভব,

এবং চৈতন্য দিয়ে ব্যক্তি হয় ব্যক্তিত্বের আপন স্থপতি,
ঘোর অন্ধকারে ওঠে বিদ্যুৎচকিত পথ ফুটে
মুহূর্তের জন্যে সেই উদ্ভাসন স্মরণে অমর—
সেই অমরতা নিয়ে শিল্পের নিজস্ব উন্মোচন,
নগ্ন গাছে জড়াজড়ি রৌদ্র-অন্ধকারে যে-আর্দ্রতা
মাটির গোপন থেকে খুলে ধরে অপ্সরী কুসুম—
সেই দেববালিকারা মানব জমিনে নেচে যায়
জ্যোৎস্নায় মদির বীথি রক্তের ভিতরে ঢেউ খেলায়
যেন জলোচ্ছ্বাসে ভাসে একা এক সুন্দর তরণী
—যত হাল ধরি, স্রোত আড়াআড়ি নদী পাড়ি ধরে
না, প্রশ্নের কিছু নেই, বাকি থাকে বেঁচে থাকা টুকু।

এমন মূর্ছার মধ্যে

এমন মূর্ছার মধ্যে পড়ে আছি, শরীরে অবোধ
তাড়না, তরুণ দিন সেতো চলেছে নিশ্চিত পশ্চিমে—
এখন কেন-যে রক্তে অসংখ্যের জন্যে লোভ, কেন
তরুণ যুবার মতো বুকের ভিতরে টান ছিলা।
সবইতো সময় ছিল, ছিল উচ্চাশার যাদুকর
ধারালো খড়্গের সিঁড়ি কেমন পা দিতে হয় জানা।
এখনো দীঘল কালো চোখে চোখ পড়লে রক্ত বাজে
ঝনঝন সমস্ত হাড় ঠিকঠাক দাঁড়িয়ে ঘাড় বাঁকায়—
—আছি আছি, যাইনি যাইনি, আমৃত্যু তোমার সঙ্গী আছি—।

টিলার মাথায় চাঁদ ভয়াল হলুদ হয়ে গেল
অরণ্যে নেমেছে সব গন্ধর্ব যুবতী, তারা যেন

নিষ্ঠুর নক্ষত্র নিয়ে পাতার মাথায় চুমকি খেলে
এবং পাতাল থেকে উঠে আসে সরস আঁধার,
ক্রমশ তা রক্ত চাখে, ক্রমশ তা বিশদ শরীরে
ধীরে শুষে নেয় উষ্ণ আর্তির অমৃত আর বিষ।
এমন নিসর্গে আমি আর কারো সঙ্গী নই, যাই
দেববালাদের কাছে, কারো পায়ে হাঁটু মুড়ে বসি,
ঐ সেই রাঙা নখ জ্যোৎস্নায় কেমন অশরীরী
এই বুক থেকে রক্ত মেখে তুমি একাকী খেলাও
ঝর্ণার শরীর থেকে হাসি নিয়ে কালো পাথরের
গোপনে রেখেছ ফণা, এখন মূর্ছার মধ্যে পাই
ঠিক মরণের আগে দেববালিকার উচ্চ হাসি।

জুলিয়াস ফুচিকের কথা মনে করে

কোথাও নির্বাধ ঘুমে আছো, কিন্তু ঘুমের ভিতরে
নিহত যৌবন, চূর্ণ জনপদ, ট্রাক্টার স্টেশন
হেক্কাব হেক্কার অসোভিৎস বা বেল্‌সেনে ছাই ওড়ে
কিংবা ক্রস, বুলডোজার, হত্যা ঘৃণা ত্রাস ও পেষণ—

নাকি তা ভুলেছ, তাই প্যানক্রাটিসে রক্তাক্ত স্মরণ
বইয়ের উচ্ছিষ্ট শব্দ!
কলকাতার দক্ষিণে উত্তরে
বিবাহের শাদা গাড়ি দেখলে বলি—দাঁড়াও মরণ
দুদণ্ড কেবল, বাঁচি আমারো স্বদেশে, বিশ্বে, ঘরে।

কিছু কিছু কথা স্মৃতি এখনও বুকের মধ্যে মণি
রোজ স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষায় ধুয়ে নিই, গর্বে তুলে রাখি
আমি জানি লাল সৈন্য যেন স্নেহস্পন্দিত ধমনী
পিকাসোর গাগারিন দীপ্ত চক্ষু আর স্নিগ্ধ আঁখি

জীবনের রঙ্গমঞ্চে দর্শক থাকেনা, কিন্তু ঠিক
ভূমিকা সবারই থাকে, মনে পড়ে, বলেছেন ফুচিক

অভিজ্ঞতা

চোখের সম্মুখে শেষে মস্ত কালো ছায়াচ্ছন্ন অস্বচ্ছ দেয়াল,
বীতশোভা,
হাত বাড়ালেই শক্ত, কর্কশ বন্ধুর লাফ আ-আকাশ শূন্য ছুঁয়ে দোলে
বন্ধুগণ, বন্ধুগণ, থামুন সম্মুখে কোন পথ নেই, অন্ধকার
নিরন্ধ্র ও বোবা
শ্লেট সদৃশ, যেন স্বপ্নপাঠ লেখা হচ্ছে, মোছা চলছে,
চোখের অনভিপ্রেত জলে।
সবাই তো একসঙ্গে দল, কিন্তু সকলে কি যৎসামান্য একটুও আলাদা
হবে না, না হতে চায় না, গড্ডল, না ভয়ঙ্কর কোন পাপে
সবাই নালিশ
কেবলই মুষলপর্ব, এবং কনুই, নাকি ঢাকের বাঁয়ার তালে
একই তাল সাধা
তা-ধিনা তা-ধিনা, আর সামান্য বৃষ্টির জলে ধুয়ে যায়
দেবী প্রতিমার রঙ, ঘাম তেল, ঝক্ঝকে পালিশ।
বন্ধুগণ বন্ধুগণ, পাথরে আমার বুক গুঁড়ো হচ্ছে, পায়ের
তলায় চূর্ণ হয়ে

আরো ঢের স্বপ্ন, অনেকের হাড়, থ্যাঁতলানো মাংসের কাদা,
করোটি ও মেদ মজ্জা স্নায়ু,
এ সময় কার পায়ে কৃতাঞ্জলি মুক্তি চেয়ে, নাকি মুক্তি
রাহুগ্রস্ত চাঁদে দিগ্বলয়ে
সেই আদিগন্ত নীল পাটকিলে প্রবালে শিখা,
দাউ দাউ জ্বালায় হু-হু বায়ু,
নাকি শুধু হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার বিরক্তি, আর নিজেকে
সান্ত্বনা দেওয়া, ওরে তোর এ-ই হারামণি
এতটুকু, এরই জন্য রাস্তায় মৃতের স্তূপ, বীরের রক্তের স্রোত
মায়ের চোখের জল
হা শহীদ

আরে আ জননী ?

অর্থাৎ শিকড়

যা থাকে অস্তিত্বে, খুব নিবিড়ে প্রোথিতমূল
অর্থাৎ শিকড়

পুঞ্জ স্মৃতিময়তার রসশিরা যার চলে গেছে
কশৈ দেবায় উৎসে প্রথম আশ্চর্য হওয়া মানুষের অতীতের দিকে,
সেই ক্রুদ্ধ খুনি সূর্য, মেদিনী আড়মোড়াভাঙা হাঁ-মুখ ক্ষুধিত বন্য
সাপের পিছল গায়ে, বাঘের সবুজ চোখে, গুহায় ধারালো অন্ধকার
কে তুমি আমারি মধ্যে ঘুম যাও, যে প্রথম গড়েছিলে
ঘসা পাথরের খাঁজে ফুল ফোটাবার চাবি, ফসল তোলার দাবি,
অমোঘ শিল্পীর হাতে
অগ্নি ও বিদ্যুতে ধাতু ধারাপাতে,
নদীর নাগিনীমুখ ঘুরিয়ে বাঁধের চুমো
কপালকুণ্ডলা স্তেপে অহল্যামাটিতে দ্রুত ট্রাক্টর প্রহার
সন্তানের জন্ম, শস্য ঘরে তোলা, গড়ে তোলা শিল্প ও কবিতা, গ্রাম
জনপদ খামার শহর
হে আমি, তোমার পায়ে মাটি কিন্তু মাথার চুলের ভাঁজে
ঝিকিমিকি নক্ষত্র নিকর
হে আমি, তোমার হাতে যন্ত্র, লাঙলের বাঁট, রমণীর স্তন, ফুল
বিদ্যুৎ ঘোড়ার বল্গা, ফার্নেসের দাউ দাউ কেশর
হে আমি, তোমার চোখে ব্রহ্মাণ্ড বিপুল গ্রন্থ খুলে ধরা
রহস্য অক্ষর

আমার শিকড়ে তিনি উন্মোচনে বীজপত্র, তিনি সেচে কুসুমপ্রসব
তিনি নক্সি গালিচার গোল ভাঁজ খুলে দিয়ে পেতে দেন

নগ নদী প্রান্তরের মহাসোভিয়েত, যাতে বসেছেন মানুষ ঈশ্বর,
বনস্পতি মহিমায় ঐ তিনি চলেছেন বংশপরম্পরা হয়ে
উৎস থেকে উৎসারে লেনিন
নদীগুলি মধুময়, বায়ু মধুময়, ধুলি মধুময়
দিনরাত্রি মধুময়, ওষধি ও যন্ত্র মধুময়, মধু
মানব মহত্ত্বে অমলিন

যা থাকে অস্তিত্বে, খুব নিবিড়ে প্রোথিত মূল, অর্থাৎ শিকড়
বছর দশক পার, বয়ে যায় সভ্যতার তৎসবিতুঃ বরেণ্যম
জ্যোতি হয়ে
মানুষের সম্ভাবনা নিযুত বৎসর ॥

আমাকে নিয়ে

আমার এসব কথা তোমাদের ভালোই লাগবে না
অথচ বন-পাথরের দেশে টান হয়ে শুয়ে আছে এক রাস্তা
বুনো মোষের দল এই মাত্র গাছপালা ভাঙার
চিহ্ন রেখে গেছে দু-পাশে
একটি পিছল দেহ শিকারী চিতা লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে গেল রাস্তা
তীব্র আলোর হেড লাইটে বিদ্ধ করতে করতে অন্ধকার
দৌড়ে আসছে যন্ত্রচড়া মানুষ
দ্যাখো দ্যাখো এই রাস্তা দ্যাখো দ্যাখো এই শরীর
ঢের দিন ঘন বনের একাকী জলধারার জলছিটোনো হাতির মতো
বড়ো বেশি খেলছ তোমরা আমাকে নিয়ে ॥

বসবাস

কথার পিঠে কথা সাজাতেই সমস্ত দিন
রঙবেরঙের থলির মধ্যে কখনো-সখনো হাত
যাদুকর বের করে আনবে নাকি
সদ্য সদ্য ডিম থেকে একজোড়া শাদা হাঁস
অথচ এরই নাম বসবাস

মাথার ভেতর মাঝেমধ্যে চিড়বিড় করে ওঠে পাগলামি
খুব জোর গলায় শিরা ফুলিয়ে যদি চেঁচিয়ে উঠি
হাওড়া-শেয়ালদার উগরে দেওয়া বেলা দশটার ট্রাফিকের
ট্রাম-বাস
একেবারে চৌরাস্তার মোড়ে
একদম লাল চোখ চেঁচিয়ে বলি থামো
চার দিকে চার হাত বের করে ছড়িয়ে দিই
এক মুহূর্তে চাউর হয়ে যায় তা হলে মাথার ব্যাপারটা

আমার সারা জীবনভর সে সাহস হবেনা বলে
আবার কথার পিঠে কথা
অর্থাৎ বসবাস ॥

নির্জনতা

আমার এখন নাকি নির্জনতার বড়ই অভাব অর্থাৎ কবিতায়
সাত হাটের হাটুরে মানুষের ঠাসাঠাসি ভিড়ে গা গুলোয়
কবিটবির ও-সব নাকি অর্থাৎ নির্জনতা বেশি রকম দরকার
এর জন্যে খুব জরুরি উড়ু উড়ু মন

কিচ্ছু ভাল্লাগেনা রে ধরনের কথাবার্তা
মাঝে-মধ্যে আমার অমন একটা ফাঁকা-ফাঁকা ব্যাপার যে হয় না
এমন নয়

ধুত্তোর রইল আপনাদের মিটিং আর বক্তৃতা
মনে মনে চলে যাই যেখানে
নিজের গায়েই নিজের ছায়া ফেলা পাহাড়
শাল বনের মাথায় আকাশের জমাট নীলিমা

কিন্তু ওখানেও আমার ভয়
জলটুঙ্গি থেকে তাকালেও নজরে পড়বে
অনেক ঢালুতে গড়িয়ে যাওয়া কার্পেটের গোল খুলতে খুলতে
সবুজ কালোর মধ্যে আঁকা-বাঁকা স্রোতোরেখার ছায়াপথ
কালো স্তন উপছে পড়া বোলডারের দিকে
এক ফাঁকে নজর বুলিয়ে ধাপে ধাপে লাফিয়ে লাফিয়ে
নেমে চলেছে যে চা বাগান হলুদ ক্ষেত
দেখা হলেই বলে উঠবে যেন ঘন অন্ধকার থেকে
একটু আগুন দেখা দিকি
ঐ আগুনের মধ্যে আমার নির্জনতা
বড় একাকিনী আমার নির্জনতা সেই বোলডারে ॥

রমণী বললে

রমণী বললে বুকের মধ্যে যেমন গুরগুর করে ওঠে
মেয়ে মেয়েমানুষ মহিলা যুবতী বা তরুণী বললে
তেমন করে নয়

পুরুলিয়া প্যাসেঞ্জার দাঁড়ালো বোধহয় আধমিনিট
যেমন ঠা ঠা রোদ তেমনি স্টেশনের নামের ছিরি
গোদাপিয়াশালে তখন লাল আংরা মাটির চৈত্র দুপুর
আর সেই রমণী
এক ট্রেন লোকের চোখে স্টেশনের ওপর একটেরে
হাঁটু ভেঙে বসেছে যেন অবহেলা কলের সামনে
একা কাকে বলে মনে হতে হতে
বেজে উঠেছিল বুঝি দূর থেকে গড়িয়ে আসা ট্রেনের হঠাৎ হঠাৎ শব্দে
একা একা কি ব্যাপার
হাওয়ার হলকায় কেমন নিরুপদ্রব পাতার শিরশিরানির তলে
শাদা শাড়ি ঠেলে উঠেছে দুটি ভরদুপুরের বকবকম গোলা পায়রা
লালচে মাটির দেশে উপছে কালো মাটির পিছল ছোপ
আপ্রাণ ধর্ষণে জড়িয়ে ধরা শাড়িতে তার উরুরেখা

বড় আলস্যে সেই দৃশ্য সেই রমণী সেই জলধারার তলে
একাকিনী চলে গেল নিঃসঙ্গ অবলীলায় শালবনের অন্তধারে
সেই রাতে চাঁদ উঠেছিল রক্তিম গম্ভীর বড়ো একা॥

আ উত্তেজনা

সে কোন উত্তেজনার অবসানে এখন ঘুমে
স্বপ্ন তাড়িতের মতো
কেবল অভ্যাস ঘুমের মধ্যেও কথা বলায়
এই সব শব্দ গেঁথে গেঁথে জাগরণ
এই সব শব্দ এলিয়ে পড়ে মুখে
তবু উচ্চারণ

মাথার মধ্যে খেলা করছে সেই বালক
বড়ো একা সে এই বিস্তৃত বেদনায়
যার নাম নিসর্গ
অন্য বালকদের সঙ্গে সে যখন খেলছে
দ্যাখো তার মধ্যে একাকীকে
ঐ সে শব্দের বালিতে খেলাঘর গড়ছে
এমন শব্দসমুদ্রের পাড়ে
ঐ সে শব্দের রাজার বাড়ি
ভেঙে ফেলছে অবহেলায়
আ উত্তেজনা আমাকে ধৈর্য দাও
আবার একটা বালিতে প্রাসাদ বানাই
যে বালি আমারই চোখের জল
আর রক্তের লবণে ভিজে ॥

যখন আমি

একসময় আমি আর দাঁড়িয়ে থাকবোনা
হাঁটুর গাঁটে জমবে শ্যাওলা
অথচ আমার সামনেই হেঁটে যাবে বুক চিতিয়ে মিছিল
ততদিন আমাকে যেন বাঁচতে না হয়

একেক দিন মনে হয় বুকের মধ্যে কেমন এক টান
সমস্ত নদীর নাড়ি যেমন টনটন করে ওঠে জোয়ার বেলায়

দেখেছিলাম ফাঁকা মাঠে সর্ষেক্ষেতের নকসি কাঁথা

গা ঘেঁষে তার হুহু ছুটছে দূরপাল্লার বাস
সমুদ্রের গা ঘেঁষে দৌড়চ্ছে ট্রেন
আতাফলের গোপনে ঘন ক্ষীরের মধ্যে ঘনিয়ে ওঠা
শক্ত বীজের গায়ে সর
এমনিভাবে সব দুপুর
আর এমনি করে হঠাৎ হঠাৎ জেগে ওঠা মধ্যরাত
উড়োজাহাজের সুদূর গম্ভীর বিষাদময় শব্দ

চোখ বন্ধ করে দেখতে পাই
বিশাল নদীর বুকে এপার ওপার মিলিয়ে দেওয়া
ঝুলন্ত ব্রিজ
দৌড়ে পার হয়ে যাচ্ছে অসহায় শুঁয়োপোকার মতো ট্রেন
টানেলের মধ্যে অন্ধকারে ধক ধক চলছে এঞ্জিনের হৃদপিণ্ড
চলেছে অচেনা গ্রামের দোপায়ায় হাঁটা পা
আলের বাঁকে কোমল ধুলোর গুঁড়োয়
লাল আলোর দোলানো লণ্ঠনে গোরুর গাড়ি

যখন আমি দু-পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবোনা
আমাকে যেন বাঁচতে না হয়।

রাজত্ব নিয়ে

রাজত্ব নিয়ে কাটা ছেঁড়া লড়াই তারই
যে দুর্বল খর্ব ও হিংসুক
আমি আমার মাটি ছেড়ে যেতে একটুও ব্যথা পাব না

কেননা মাটি কারো একার নয়
একার জন্যে নয় ফুল ফোটা বা সন্ধ্যার পরে
হঠাৎ লোডশেডিং-এ বেরিয়ে পড়া গম্ভীর চাঁদ

রমণী কেমন চিবুক তুললে ভোর
আর নামালেই সন্ধ্যা
তেমন রাজত্ব আমার ছিল

মানুষের পাশপাশি হাঁটা যেমন উদ্দেশ
আর নিজের চলায় নিরুদ্দেশ
তেমন বাহিনীতে আমিও ছিলাম

পথে যেতে যেতে শকুন নামতে দেখেছি
মৃতদেহের উপর
এমনকি মানুষের দেহ কেমন ছাই হয়ে
কেমন কবরে মাটিতে মিশে
ফের মানুষের শরীরে ফিরে আসার রহস্যে উর্বরতা

বামনের প্রতিবাদ
দাম্ভতার হিংস্র বর্শাফলক
কেমন আক্রোশের নখ আর দাঁত
আমি অক্লেশে বহন করেছিলাম

মাটি ছেড়ে যেতে আমার দুঃখ নেই
যেখানে মানুষের পা
যেখানেই পড়ে আছে সিংহাসন।

যুবক-যুবতী

যুবক যুবতীরা এখন বড়ই ব্যস্ত নিজেদের নিয়ে
তারা কথা বলছে   শপথ করছে আস্থায় বিশ্বাসে
অথচ বুনো ঘোড়ার ঘাড়ের ধনুকে কাঁধ বাঁকিয়ে
আগের প্রজন্মগুলিতে চোখ কুঁচকে দেখছে
অবিশ্বস্ত   অসাধু   তঞ্চক

তরুণেরা, আমরা ততটা অসাধু ছিলাম না
যতটা অসাধু হওয়া যায় নিজেদের শিকার ভেবে ভেবে
আর অন্যদের শিকারী মনে করে

যুবক যুবতীটিকে কাছে টানছে
কেমন আলস্যে হাঁটু ভেঙে বসেছে তরুণী
মেলে ধরেছে তার গোপন পদ্ম
তরুণটি জানুতে কেমন পাঞ্চালে বসেছে ধনুর্ধর
আলস্যে হাত বুলোয় তার ধনুক, কচি কিশলয়ের মতো পালিশ
করা গ্রীবায়
এক সময় উঠে চলে যায়   যেমন করে মানুষ তার
নিজের মরণের পথ নিজেই তৈরি করে চলে যায়

যুবক, আমাদেরো মধ্যে ছাখো ঐ একই অতীত
যুবতী, আমাদের মধ্যে ছাখো ঐ একই আস্থা
যে কথাগুলিকে তোমরা বিশ্বাস করতে ভালোবাসো আর বলো
আমরাও তেমনি বলেছি, আমাদের সময়েও রমণীর শরীরে ছিল
বেল ফুলের বাগানে বৃষ্টি নামার পর মাটি মাখানো গন্ধ

পুরুষের গা দুলে উঠতো
জ্যোৎস্নারাতে বুকের মধ্যে একা এক উদাস বাঘ
    হাঁ-কার না দিয়ে দমফেটে ঘুরতো
সেই নদীটির ধারে
যার নাম কবিতা

দ্যাখো দ্যাখো সেই একই নদীতে পড়েছে
    কেমন প্রশান্তিতে দূরের আকাশের গোল চাঁদ
    অথচ ছুঁতে গেলেই যা ভেঙে যায়॥

বালক বেলার কথায়

গোমো স্টেশনে ভোরবেলায় নামা গেল
ক-ঘণ্টা বাদেই আমার গাড়ি মিলবে যেন মনে পড়ছে
ঢং-ঢকাস করে শান্টিং-এ গাড়ি জোড়া হচ্ছে
আবছা আলোয় দূরে দূরে টিলা
হঠাৎ কেমন হালকা হাওয়ায় উড়ে আসছে বালকবেলা

আসলে বালকবেলা ব্যাপারটাই বোধহয় ছিল না
সঙ্গীসাথী বা সঙ্গিনী
বালি নিয়ে নুড়ি দিয়ে ঘরবাড়ি বানানো
            কিংবা হা ডু ডু বা গোল্লাছুট
সব খেলাতেই অধম খেলুড়ে
বাতাপী লেবুর ফুটবল খেলায় আমি গোল রক্ষক
অন্য সবাইয়ের জামা যখন ঘামে ভেজা
বল ওরা কায়দা করতে পারছে না ভেবে আমার পা যখন নিশপিশ
আমার অজ্ঞানতেই গোলের মধ্যে বল ও ধিক্কার তখনই

ক্রিকেটে ফিলডিং খেলিয়ে ব্যাট ধরার আগেই সন্ধ্যা হয়ে যেত
আমার ঘুড়িই ভো-কাট্টা হতো সবার আগে
পরীক্ষায় পয়লা নাম যখন আমার হাতের মুঠোয়
বাবা বদলী হয়ে যেতেন অন্য মফঃস্বলে
সবার শেষের হোঁচট খাওয়া রোল নম্বর আবার আমার জন্যে
মনে মনে প্রতিদ্বন্দ্বী সবার রমণীমোহন অথবা স্ট্রাইকারের
এমনি করে গলার মধ্যে চাপা আওয়াজে উচ্চারণ
একেকটা শব্দ
শব্দ নিয়ে দমবন্ধ জগতে খোলা মেলা ভ্রমণে
খেলতে খেলতে গুনগুনিয়ে উঠলো কবিতা
এখন পোড়া চোখে অনেক কিছু না দেখবার জন্য
নামিয়ে রাখলেই চলে ভারি চশমা

ঢং ঢকাস আর্তনাদে কাপলিং-এ গাড়ি জুড়ছে
জায়গা নেবার আগেই কি করে যেন কামরাগুলি পা দানি পর্যন্ত
উপচে পড়ছে
উঠবো বলে ভিড়ে ঠাসা কামরার পর কামরা পার হচ্ছি
এমনি সময় রাজেন্দ্রাণীর মতো ট্রেন ছেড়ে দিল ॥

মৃতদেহ

অনেকগুলি হাতের বৈঠার উপরে তার দেহ
জনস্রোতের প্রবল ধাক্কার ভাটিতে ফেনা
নাকি মকরবাহিনীর
পূজার ফুল

এমনি করে একটা দিন চলে গেলে একটি করে দুর্ভাবনা
এমনি করে একটা মানুষ চলে গেলে এমনি এক ভাসান
এমনি করে এক একটা শব্দের অভ্যুত্থান আর বিনাশ

আমি ঠোঁটের কুলুপ বন্ধ করব ভাবলাম
পাছে আমার শব্দগুলি অমনি ভেসে যায়

শেষ গাড়ি ধরবার জন্য যতই উর্ধ্বশ্বাস
তবু জানতে বাকি নেই ফাঁকা ঝুলিতে আছে
সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় ফুলে উঠা অনেকগুলি অমনোনীত শব্দ
আমার অতি চেনা জানা ভালোবাসার মুখ
চোখের জলে ভেজা দারুণ দাঙ্গাবাজ
অসম্ভব ভীতু ভীষণ ডাকাবুকো মন্থর উদ্দাম

আমাদের যৌবনের মতো ॥

একটা বয়স আছে যখন

একটা বয়স আছে যখন বন্ধু বলতে আর কারো খোঁজই মেলে না
পাথর কাটার উপত্যকায় কারো তখন ক্যাম্প
দূরে দূরে গুমগুম করে ফাটছে কোথাও ডিনামাইট
কাঁধে রাইফেল মাথায় ফেল্ট—নেমে যাচ্ছে বনের দিকে
সেই মানুষটি
কবে বালকবেলায় মুনিয়া মরেছিল বলে সাতদিন স্কুলে যায়নি

কে জানে বয়সেরই নাম নিষ্ঠুরতা কিনা

এপার ওপার বাঁশের আড়ায় একটা হাত
হালকা পায়ে কচুরিপানার জলা পেরিয়ে এলো সূর্য
মাইন্যাস পাওয়ারের ভারি চশমায় তার সামনে খোলা
চাষবাস গ্রাম নদী আর গাছপালায় দাগকাটা লেজার খাতা
এক দৌড়ে চলে আসে সন্ধ্যাবেলা অসময়ে
একবার চশমা চোখ থেকে নামালেই

হাঁটু ঠিক কাঁপেনা কিন্তু মাঝেমধ্যে পাখনার বাঁ দিকে ব্যথা
কে জানে কত মোট বয়ে চলেছে সেই নৌকা
রক্তের ঢলে তার উজান ভাটি নাকি হাটগঞ্জ

তিন পাহাড়ের ঘাড়ের উপরে পা ফেলে দাঁড়ালো মস্ত মহিষ
তারপর শিঙ নীচু করে তাড়িয়ে নিয়ে চললো
সমতলের গাঁয়ের দিকে অন্ধকার

তখন সবে জ্যোৎস্না পিছল বনে কিছু কিছু তারার আঁচড় দেখে
শিউরে উঠছিল প্রস্রবণ

আমি একা একাই হেঁটে ফিরছিলাম টিলার উপরে বাংলোয়
আমার রমণীর কাছে ॥

কবিতার বিষয়

অনেক কিছুই আর তেমন সোজাসুজি কবিতার বিষয়ই নয়
যেমন ফুল যেমন পাখি যেমন রমণী
অথচ এরা কেমন জড়িয়ে আছে অস্তিত্বে
যেমন মাটি যেমন আকাশ যেমন সন্তান

অথচ বলতে গেলে এরাও যেন আর
কবিতার বিষয়ই নয়

চাঁদ উঠে এলো কলকাতার আকাশে রাত্রি সবে নটা
এমন কি এসপ্ল্যানেডের উঠতি ধনী পথচারীও নীচুগলা হয়ে যায়
আমাদের এই ঘিঞ্জি কলেজস্ট্রীট পাড়াতেও
ট্রামগুলি রূপোলী রেখার সমান্তরালে
মায়াবী হয়ে নিঃশব্দে গড়িয়ে যেতে চায়
আকাশে গোল চাঁদ আততায়ীর মতো তীক্ষ্ণ চোখ
বুড়ি শহরের ঘণ্টা-মিনিট পাগল মানুষগুলি
দেখেও দেখছেনা যেন তাদের নামের পাশে মস্ত লাল ঢ্যাঁরা

এমনি দেখেছি নদীর পাশে
কোনো নতুন শহরে পৌঁছলেই জানতে চাই তার নদীর নাম
কাঠখোট্টা মানুষটি চাপা বিরক্তিতে নদীর ধারে পৌঁছে দিয়ে
উদাস হয়ে যায়
এক ঝাঁক পাখির খিল খিল উড়ন্ত রেখা
স্রোতের ধাক্কায় প্রবল ফেনায় তার রক্তে
চেনা চেনা মনে হয় বুঝি
রমণীর সামনে গলার স্বর যেমন নেমে যায় কিংবা হঠাৎ
উঠে যায় বেতালায়
তেমনি কিছু কিছু বড়ো রহস্যময় ব্যাপার স্যাপার আছে

অনেক কিছুই তাহলে কবিতার আর বিষয় নয়
না ফুলফোটা না পাখির উড়ন্ত ছবি
না রমণীর ঈষৎ বঙ্কিম মুখ ঘাড় ফেরানো অচেনায় গালের
একপাশ ॥

যা সহজ একান্তই

অনেক রকম তালফেরতা কথা আছে রংবাহার
চটকদার শব্দ
এমনকি শব্দের মধ্যেও ঘুম যায় শব্দেরও অতীত অন্য কিছু
দুটি শব্দের স্তনচূড়ায় মাঝের খাঁড়িতে
নাক ডুবিয়ে চোখ বুঁজে পড়ে রয়েছে পেশল অন্ধকার
সেই শব্দগুলিকে জাগিয়ে তোলার মধ্যেই কবিতা
উচ্চারণের ঘন অরণ্যের কোল ঘেঁষে বয়ে যায় যেখানে
অচেনা নদী অজানা ঢেউ
মাঝেমধ্যে পাখা ঝাপ্‌টে উড়ে যায় অদৃশ্য পাখি
ডালপালার জটিল ধাঁধা পার হয়ে

একজন মানুষ ঐ চলেছে আলপথে
এইমাত্র সে নামলো ছই উপছে পড়া দেহাতী লজ্‌ঝরে বাস থেকে
এখন তার পায়ে জমবে ধুলো
পথের পাশে হেলঞ্চ কলমী পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে তাকে
যেখানে তার রমণী যেখানে তার সন্তান
তারই স্বপ্নের মাঠ জুড়ে এখনই তারই কব্জির ঘামে
ফুলে উঠেছে ধানের মধ্যে গোটা গোটা চাল
একটা জীবন শূন্য করে দিতে দিতে
বদল ঘটে যায় মাটি গেরস্থালি স্বদেশ

একটা জীবন কখন অবলীলায় প্রবাহিত হয়ে যায়
আরেক জীবনে বংশধারায় ভবিষ্যতে
এমনি করে শব্দগুলি একেকটি উচ্চারণ
একটি কবিতার পঙক্তি রক্তের ঘনমহিমায় চরাচরের স্বাদ

যেমন একটা বিপ্লব শিকড় ধরে টান মারে অস্তিত্বের, আর
নতুনতর জন্ম কেমন সভ্যতার বিন্যাসে সেঁধিয়ে দেয় তার শিকড়

একটা পাখি ডানা ঝাপটায় অদৃশ্য
কোনো অচেনা নদী বয়ে যাচ্ছে বয়ে যাচ্ছে
ঘন অরণ্যের পায়ের কাছে
এমনি সব অচেনা অজানা মুখগুলি
কবিতায় হয়ে যায় চিরকাল
উচ্চারণ বদলে যেতে যেতে খুলে ধরে
দিগন্তের মধ্যে দূরবিস্তারী দিগন্ত ॥

পায়ের পাশে যখন খাদ

এখন তোমার কেমন দীঘল বাহু,
কেমন চিকন সজীব শাল তরুণ তুমি
এই তো আকাশের দিকে হাত বাড়াবার সময়
কেননা এ-বয়সটাই বড়ো পাওয়ার দাবিতেই স্বাভাবিক
কেননা এ-বয়সটাই কেমন মাঝরাতে ঘুমভেঙে দূর পাহাড়ে
ডিমডিম গলাচাপা নাকাড়ার মতো ভয়ের

দ্যাখো দ্যাখো তুমি যেন এক কেউটের ফণার মতো
সব চোখের কুটিল ঢেউয়ের বুকে ছিপনৌকায় শরীর
একদিকে গলুই বড়ো অভিমানে বারবার ধাক্কা দিচ্ছে ডাঙায়
অন্যদিকে কুটো ছেঁড়া কালিন্দীর বুকে ঝাঁপ দেবে বলে
শিরায় পেশীতে কেমন জলরেখার চক্রান্ত

দূর থেকে হাতছানি দিচ্ছে স্টার্টারের নিশান
জয় নয় পরাজয় নয়
কেবল চলে যাবার দিকে
এখন তো আমিও দাঁড়াতে দাঁড়াতে
টালসামলে নিচ্ছি পাছে না গড়িয়ে পড়ি
এখন তো আমার হৃদপিণ্ডে
নৃত্যপর পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ
বিঁধিয়ে দাঁড়াবেনা কোনো সর্বনাশী
এখন পিঠ সোজা করে উঁচু ঘাড়ে আকাশের দিকে তাকালেই
মেঘ লাফিয়ে পড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘায়
মনে পড়ে যায় পায়ের পাশেই খাদের কথা
সেখানে আকাশের দিকে আঁকশি বাড়ানো বুনোলতা
ঢেকে রেখেছে আর হাল্কা হাওয়ায় খুলে ধরছে
কেবল আমার চোখেই
পাতালছোঁয়া নিরুদ্দেশ

ওহে যুবক ভয় কি তোমার, তোমার জন্যেই ঐ খাড়া শিখর
অম্লান বাতাস তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছে সেখানে
নইলে কেমন করে হাসিমুখ শস্যের চারা
খেলা করবে তোমার বাহুতে তোমার জানুতে
নইলে কেমন করে তোমার পাশে
ঠোঁটের ফাঁকে ভোর রাতের শিশির পিছল খাঁ খাঁ মাঠের
জ্যোৎস্না নিয়ে
আশরীর অবসাদে ঘুম যাবে রমণী ॥

গ্যেটে পার্ক

এই-যে দীর্ঘদেহ গাছের সারি
মধ্যে বয়ে চলেছে আঁকাবাঁকা খাঁড়িতে জলস্রোত
এই রাস্তায় তিনি অন্য মনে হাঁটতেন
কখনো বাগানবাড়ির চত্বরে বসে
আঁকিবুকি কাটতেন মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে
ভাবতে গেলে গা শিউরে শিউরে ওঠে

গ্যেটে পার্কের এই উঁচু-নিচু রাস্তায়
রমণীকে ভালোবেসে তারপর সুদূর প্রত্যাখ্যানে
নিজের সময়কে ভালোবেসে তারপর ভাবিকালের হাতে তুলে দিয়ে
প্রতিভাকে দৈনন্দিনের ঘর সংসারে ঘুরতে ফিরতে দিয়ে
তারপর একটি সুতোয় অতীত আর বর্তমানকে
ভবিষ্যতের সঙ্গে বেঁধে
কেমন অবহেলায় তিনি ঈশ্বর
কেমন অবলীলায় তিনি শিল্প নিয়ে খেলাঘরের শিশু

আমি ভাবতে পারছি
তাঁর খড়্গা নাকে জমেছে শীতের তুহিন
তাঁর ঠোঁটের দিকে ঠোঁট এগিয়ে ধরেছে রমণীর মতো পৃথিবী
এবার তিনি চুম্বন সমাপনে আলিঙ্গনে তাকে বেঁধে
ধীর পায়ে ফিরে যাবেন উঁচু টিলার দিকে
যেখান থেকে চোখে পড়বে থুরিঙ্গা প্রদেশের দীর্ঘ দিগন্ত
ফসল ও গীর্জা ঘর
তারপরে পা ফেলে পা ফেলে
চলে যাবেন চিরকালের রাস্তায় ॥

শূন্যতার অর্থ

আমার কাছে শূন্যতার কি অর্থ কেমন করে বলি
ভরা গ্রীষ্মে আকাশের মধ্যে যেমন আকাশ
সুদূর হয়ে যায় ধারালো তীব্রতায় ফাঁকা
বৃষ্টির মধ্যে ঘন-বৃষ্টি যেমন পথচারীকে
আড়চালায় আটকে রাখে উদ্বিগ্নতার যা বিপরীত
স্টেশনে পৌঁছে দেখলাম আমারই ট্রেন
এই মুহূর্তেই রওনা হয়ে গেল বলে
পেছনের লাল বাতিটি কেমন সুদূর সুদূর
এমনি একটা কিছু আমার মাথার মধ্যে
যাকে আমি কিছুতেই ধরতে পারি না
যাকে আমি কিছুতেই ভরতে পারি না
এমন কি রমণীর মধ্যে প্রবেশ করার পরে
বুকের মধ্যে ফাঁকা হয়ে যায় সম্প্রদান
বৃষ্টিতে ভিজে আমার রমণীর মুখ এখন বড় কচি
চোখের পাতায় নধর ধানগাছের উত্তেজনা
নত হয়ে তার পায়ে আমার ঠোঁট ছোঁয়াবার আগে
মনে পড়ল সেই শূন্যতা
যা সে যখন ঘরে ছিল না বলে
যা সে যখন ঘরে এলো বলে
আমার দেহের মধ্যে এমনি কে এক প্রবল
কেবলই শোনাই শূন্যতা শূন্যতা
ট্রেনের চাকা লাইনে চলে গেলে
দূর থেকে যেমন কাঁপতে থাকে তার বিধূনন
আমার গায়ে রোমাঞ্চের মতো সেই প্রতিধ্বনি।

তোমাদের মিটিঙে

দিনগুলি কি পাথার পেরোনো
দিনগুলি কচুরি পানায় দাম ভরা নদীতে লগি মারছে
একটু এগোবো
হাওয়ার কাছে পাল খুলছে হাওয়া
একটু এগোবো
এমনি সব কাহিনী কথায় গল্পের ছলে
সব নদীদের গান সব ফসলের সব দুঃখের কথা
তোমাদের মিটিঙে এসে বলতে চাই
বলি
যখন নদীগুলি কচুরি পানার ফুল
মাথার সবুজ গামছায় বেঁধে
হা রে রে রে   হেঁকে পথ আটকে ধরে
বেনামী জমির   জোতদারের লেঠেল
যখন মাঠগুলি মস্ত জাজিমের গোটানো গোল খুলে গিয়ে
বিপুল জ্যোৎস্না ঢেউ আর ঢেউ   ধান পাট তিসি

তখন আমার বুকের মধ্যে দামাল খোকা মুখ ঘসছে
মুক্তি চাইছে হাওয়ায় খেলতে চাইছে স্বপ্নে
আমি কি তাকে ঠ্যাঙাড়ে লেঠেলদের জাঙ্গাল
পার করে নিয়ে যেতে পারবো তেমন সব দিনে
এই তো আমার বাহু
এই তো আমার কাঁধ
এ-সব কথাই বলতে এলাম
কবিতায় গল্পে
তোমাদের মিটিঙে ॥